প্রথম পার্টি কংগ্রেস ২০২২, ঢাকা

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত মূল্যায়ন

(Evaluation on International Situation)

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

প্রথম পার্টি কংগ্রেস ২০২২, ঢাকা

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত মূল্যায়ন

(Evaluation on International Situation)

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : +৮৮ ০২ ২২৩৩৫২২০৬, ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ২২৩৩৫১৩৩৫
ই-মেইল : mail@spb.org.bd

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২২, ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ : আব্দুর রাজ্জাক রুবেল

মুদ্রণ : গ্রন্থিক মিডিয়া
১১০ আলিজা টাওয়ার, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৬৭৬ ৩১৩৯৫৭ ই-মেইল : press@.gronthik.com

মূল্য : ৫০ টাকা

আমাদের দল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর প্রথম কংগ্রেসের ২৮ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি অধিবেশনে (Delegate Session) কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে উত্থাপিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত মূল্যায়নের খসড়া প্রস্তাবের উপর প্রতিনিধিদের বিস্তারিত আলোচনার পর কিছু সংশোধনীসহ গৃহিত হয়। পরবর্তীতে ১১-১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক সদস্যদের সভায়ও এ রিপোর্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এবং কংগ্রেসের দলিল হিসেবে প্রকাশ ও প্রচারের জন্য অনুমোদিত হয়।

ধন্যবাদান্তে

খালেকুজ্জামান
সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় কমিটি,বাসদ

প্রথম পার্টি কংগ্রেস ২০২২, ঢাকা

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত মূল্যায়ন

(Evaluation on International Situation**)**

কার্ল মার্কস দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদ জন্মলগ্ন থেকেই অন্তর্নিহিত সংকট নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে। তথাপি, বিগত শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে যখন পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজির (monopoly capital) স্তরে প্রবেশ করে লগ্নি পুঁজির জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে তখন থেকেই সংকট চরম আকার ধারণ করে এবং সংকটের চরিত্র ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছায়। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব পৌঁছায় অনিরসনীয় পর্যায়ে। এই সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়, কিন্তু পুঁজিবাদী দুনিয়া সংকট থেকে পরিত্রাণ পায়নি। মার্কসবাদী বিশ্লেষণ অনুযায়ী তা পাওয়ার কথাও ছিল না। তাই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের প্রথমদিকে যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিকাঠামো পুনর্নির্মাণের কারণে কিছুদিনের জন্য আপাত প্রবৃদ্ধি দেখা গেলেও অচিরেই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় চরম সংকটের পরিবেশ পুনরায় ফিরে আসে এবং বর্তমান সময়ে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে।

১৯১৭ সালে প্রথম সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই চীনসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করতে শ্রমিকশ্রেণি সক্ষম হয়। নবগঠিত এই সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা শ্রমিকশ্রেণিসহ দেশে দেশে নিপীড়িত মানুষের জন্য যে মুক্তির দিগন্ত উন্মোচিত করে দেয়, তাতে ভীত হয়েই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের বেশ ধারণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সংকটের তীব্রতায় সেই বেশ তারা বেশিদিন ধারণ করতে পারেনি। গত শতাব্দীর সত্তর/আশির দশকেই সেই মুখোশ খুলে ব্যাপক বেসরকারিকরণ ও বিলগ্নিকরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বপুঁজিবাদী শিবির তখন কোনোমতে বাঁচার পথ খুঁজতে শুরু করে। তা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গভীর রূপান্তর ঘটেছে। বাস্তবে ১৯২৯ সালে অভূতপূর্ব অতিরিক্ত উৎপাদনের সংকট আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। মার্কস বলেছিলেন, অতি-উৎপাদনের সংকট থেকে পুঁজিবাদের রেহাই নেই, কারণ এটা পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত অবশ্যম্ভাবী ভারসাম্যহীনতার সংকট। মার্কসের সেই কথাকে বাস্তব প্রমাণ করে নানামুখী প্রচেষ্টার পরও পুঁজিবাদী দুনিয়া অতি-উৎপাদনের সংকট থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বরং তার হাত থেকে মুক্তির আশায় উদ্ধার পরিকল্পনার ব্যাপক

বাস্তবায়নের ফলে সংকট আরও তীব্র হয়েছে। সবচেয়ে শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সরকারি ঋণের বিস্ফোরণে অর্থনীতিতে দেখা দিচ্ছে অস্থিরতা, আস্থাহীনতার প্রকাশ হিসাবে নিয়মিতভাবে আর্থিক খাতের (financial sector) পতন ডেকে আনছে। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বিশ্ব অর্থনৈতিকব্যবস্থা আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের কৌশলবিদদের উজ্জ্বল পূর্বাভাসগুলিকে বারংবার মিথ্যা প্রমাণ করেছে এবং অন্ধকারতম দিনের হতাশাজনক আগমন বার্তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নানা মিথ্যা তথ্য ও কুযুক্তি দিয়ে তাকে অস্বীকার করতে চাইলেও বুর্জোয়া মতাদর্শের ভিত্তির অসারতাকে আজ আর কোনভাবেই ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। যত দিন যাচ্ছে, ততই বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থা সংকটে জড়িয়ে পড়ছে, ততই জনগণের ক্ষোভ-বিক্ষোভ এমন রূপ নিচ্ছে যে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বুর্জোয়ারা আর জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের কাছে ছেড়ে রাখা নিরাপদ মনে করে না। তা আজ আমাদের দেশে যেমন স্পষ্ট, তেমনি বিভিন্ন দেশেই প্রমাণিত হচ্ছে। গত কয়েক দশকে পুঁজিবাদী দেশগুলো নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য লড়াই নির্মূল করতে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার সুরক্ষিত করতে অর্থনৈতিক সুরক্ষাবাদের (economic protectionism) নীতি মেনে চলার প্রবণতাকে দূর করে বিশ্ববাণিজ্য প্রসারের চেষ্টা। ঢাকঢোল পিটিয়ে যে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) গঠন করা হলো তার কার্যকারিতা আজ প্রশ্নের মুখে। নতুন করে আবার সেই সুরক্ষাবাদ (protectionism) মাথা চাড়া দিচ্ছে। বিশ্ব পরিসরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইইউ-এর কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা এবং ঝগড়া-বিবাদ দেখা দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আশঙ্কার জন্ম দিচ্ছে। অন্যদিকে বিশ্বে যে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অস্তিত্ব ছিল তার নেতৃত্বের একাংশের মধ্যেও গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষভাগ থেকে দেখা দিতে থাকে সংশোধনবাদী প্রবণতা। আশির দশকে এসে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশে সংশোধনবাদী নেতৃত্ব কেবল পাকাপোক্তভাবে গেড়েই বসেনি, ধীরে ধীরে তারা প্রতিবিপ্লবের দিকে এগুতে থাকে। ফলে শ্রমিক-কৃষকসহ শোষিত শ্রেণিসমূহের আন্দোলনকে প্রবল অনুকূল পরিস্থিতি (objective condition) সত্ত্বেও বিপ্লবের স্বার্থে কাজে লাগানো যায়নি। বরং শোধনবাদী রাজনীতির কবলে পতিত হয়ে বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগ্রাম এতটাই দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে, দুর্বল ও সংকট জর্জরিত পুঁজিবাদকে সামনে পেয়েও সংগ্রামের যথাযথ শক্তি সংগঠনে ব্যর্থ হয়ে এবং যথার্থ মার্কসবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও দিশার অনুপস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণি বিপ্লবের অগ্রযাত্রাকে

নিশ্চিত করতে পারছিল না। আমাদের দেশের পরিস্থিতি তার চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিল না। এহেন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল একটি সঠিক বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠার — যে দল দেশে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকবে, শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেবে, মার্কসবাদের সৃজনশীল চর্চা করবে এবং বাংলাদেশের খেটেখাওয়া অগণিত জনতার মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করবে। সেই তীব্র শ্রেণিসংগ্রাম থেকেই জন্ম নেবে ইস্পাত-কঠিন কমিউনিস্ট চরিত্রের অধিকারী নেতা-কর্মী যাঁরা বিপ্লবের অগ্রদূত (vanguard) হিসাবে ভূমিকা পালন করবে। যাঁরা বিপ্লবের প্রতি, জনগণের প্রতি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি মানুষের আস্থাকে ফিরিয়ে আনতে ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অগণিত শহিদের আকাঙ্ক্ষিত গণমুক্তিকে সফল করতে পারবে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৮০ সালের ৭ নভেম্বর আমাদের দেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে আমাদের প্রিয় দল— 'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর পর ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে দুই দিনের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ঢাকায় আমাদের দলের প্রথম কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও, ১৯৮০ সালের ৭ নভেম্বরে দল ঘোষণার সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যেমন ছিল, ২০০৯ সালে ডিসেম্বর মাসে বিশ্বের রাজনৈতিক বাস্তবতা ছিল এক অর্থে স্বতন্ত্র। মূল দ্বন্দ্বগুলোর প্রেক্ষিতে কনভেনশনের সময় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এই অর্থে মৌলিকভাবে পৃথক ছিল যে, তখন আর সমাজতন্ত্র বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে টিকে ছিল না। আজ আমাদের প্রিয় দলের প্রথম কংগ্রেস যখন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তখনও বিশ্ব-ব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের সহায়ক ও নিয়ামক প্রবল শক্তি হিসাবে উপস্থিত নেই।

বর্তমান বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও বাস্তবতা

১৯৮০ সালের ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ গঠনের পরবর্তী সময়ে, গত শতাব্দীর আটের দশকের শেষ থেকেই, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে সংশোধনবাদ চূড়ান্ত পরিণতির দিকে যেতে থাকে। একে একে পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রতিবিপ্লব সম্পন্ন হয় এবং প্রতিটি দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায়, ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে, বিশ্ব-সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিপর্যয় নেমে আসে। সোভিয়েত ইউনিয়নে শোধনবাদী গর্ভাচেভ চক্রের নেতৃত্বে প্রতিবিপ্লবের কারণে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রই ভেঙে পড়ে। সোভিয়েতের অন্তর্ভুক্ত প্রজাতন্ত্রগুলো একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক

ব্যবস্থাকে প্রতিটি প্রজাতন্ত্র বাতিল করে দেয়। এই সময়কালে সাম্রাজ্যবাদ শিরোমণি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সংশোধনবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ও ন্যাটোর ছত্রছায়ায় যুগোস্লাভিয়াকে ভেঙে খান খান করে। যার ফলে বিশ্বপরিস্থিতির গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয়।

১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের আগে বিশ্বপরিস্থিতির নিয়ামক প্রধান দ্বন্দ্বগুলি কী কী তা তুলে ধরেছিলেন বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা কমরেড লেনিন। তাঁর শিক্ষার মর্মবস্তুকে সূত্রাকারে তুলে ধরেন তাঁর সুযোগ্য ছাত্র মহান স্ট্যালিন। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত *ফাউন্ডেশন অব লেনিনিজম* পুস্তিকায় তিনি দেখান — লেনিন বিশ্বপরিস্থিতির নিয়ামক হিসাবে তিনটি প্রধান দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন। প্রথমত, শ্রম ও পুঁজির মধ্যে দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের পরস্পরের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও তৃতীয়ত, গুটিকয়েক সাম্রাজ্যবাদী দেশের সাথে ঔপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর দেশগুলির জনগণের দ্বন্দ্ব ('contradiction between the handful of ruling, "civilised" nations and the hundreds of millions of the colonial and dependent peoples of the world')। এই তিনটি দ্বন্দ্বের পরিবেশে অক্টোবর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়ার আবির্ভাব ঘটেছিল। মনে রাখা দরকার অক্টোবর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা কেবল একটি দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা মাত্র নয়। সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মদদপুষ্ট জার আমলের প্রতিবিপ্লবী শক্তি দেনিকিন, কোলচাক বা রেঙ্গালকে শুধু নয়, চৌদ্দটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশের সশস্ত্র সেনাবাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণের মোকাবিলা করে গড়ে উঠেছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া। সেই কারণেই জন্মলগ্ন থেকেই বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, সামাজিক, এমনকী সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিশ্ব-রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া আবির্ভূত হয়েছিল। অক্টোবর বিপ্লবের অগ্রযাত্রায় পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সূচনা পর্বেই প্রমাণ করেছিল পুঁজিবাদের তুলনায় সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকাল জুড়ে ইউরোপব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের ঝড়ো হাওয়া এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার বিজয়ের কারণে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়। চীনে মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে বিপ্লব সফল হওয়ার কারণে এশিয়ার ও বিশ্বের সর্ববৃহৎ জনবহুল অংশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। কমরেড মাও-এর নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক চীনের প্রশংসনীয় ও সহযোগী ভূমিকার ফলে কমরেড কিম ইল সুং এর নেতৃত্বে

কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টি ও জনগণের বীরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা কোরিয়ার যুদ্ধে পরাস্ত হয় ও সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়া গড়ে ওঠে। এইভাবে বিশ্বে একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। একদিকে যুদ্ধবাজ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এবং অন্যদিকে খেটে-খাওয়া গরিব ও শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবী আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে সমাজতান্ত্রিক শান্তিশিবির — এই দুই মেরুতে পৃথিবী বিভক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর দেশগুলির জনগণের যে দ্বন্দ্ব-লড়াই-সংগ্রামের কথা কমরেড লেনিন তৃতীয় নিয়ামক দ্বন্দ্ব হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন তার প্রধান সহায়ক শক্তিস্বরূপ নতুন শিবির হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা। এই দুই শিবিরের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিশ্বপরিস্থিতির অন্যতম নিয়ামক দ্বন্দ্বের রূপ নেয়। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অস্তিত্বের মধ্যেই যুদ্ধের কারণ নিহিত থাকলেও একটি বিশেষ যুদ্ধ বিশেষ মুহূর্তে ঘটবে কী ঘটবে না বা ঘটলেও তা কতখানি ব্যাপ্ত হবে তা নির্ধারণে সমাজতান্ত্রিক শান্তিশিবিরের অস্তিত্ব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে থাকে। শুধুমাত্র বিপ্লবী শ্রমজীবী শ্রেণির আন্দোলন নয়, এমনকী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত সদ্যস্বাধীন দেশগুলির পুঁজিপতিরা নিজ নিজ দেশে পুঁজিবাদের দ্রুততম বিকাশের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ভেতরের এই দ্বন্দ্বকে দরকষাকষির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে পেরেছিল।

কিন্তু গত শতাব্দীর নব্বই দশকের সূচনায় প্রতিবিপ্লবী উত্থানের কারণে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ভেঙে পড়ার মধ্য দিয়ে এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। যদিও প্রজাতন্ত্রগুলো ঐক্যবদ্ধ থাকার যে বস্তুগত উপাদান তার ক্রমান্বয়ে বিনাশসাধন প্রক্রিয়ার শুরু হয়েছিল বিংশতি কংগ্রেসের পর সংশোধনবাদী নেতৃত্বের হাত ধরেই। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ঐক্যের কারণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে স্ট্যালিন বলেছিলেন যে — 'সোভিয়েত শাসন ভাবনা, যার অন্তর্নিহিত চরিত্রই হলো আন্তর্জাতিক, এমনভাবেই নির্মিত হয়েছে যে, এটি সমস্ত দিক থেকে জনগণের মধ্যে মিলনের ধারণাকে লালন করে এবং নিজেই প্রজাতন্ত্রগুলোকে ইউনিয়নের পথে পরিচালিত করতে প্ররোচিত করে।... এই কারণে আমি বলি, এখানে, সোভিয়েত বিশ্বে, যেখানে শাসন মূলধন বা পুঁজিকে ভিত্তি করে নয়, শ্রমের উপর ভিত্তি করে, যেখানে শাসন বেসরকারি সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে নয়, কিন্তু যৌথ সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে, যেখানে শাসনব্যবস্থা মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের ভিত্তিতে নয়, বরং এই ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিত্তিতে, এখানে শাসনের স্বাভাবিক চারিত্রিক প্রবণতা হলো শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে

একক সমাজতান্ত্রিক পরিবার গড়ে তোলার দিকে আকাঙ্ক্ষা লালনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।' (ওয়ার্কস-৫, পৃ-১৫২-১৫৩) সংশোধনবাদী ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব বিংশতি কংগ্রসের পর যখন উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপকরণের উপর ব্যক্তি অধিকারকে ফিরিয়ে আনল, ব্যক্তি পুঁজিকে সংহত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিল, তখন পুঁজির পরিবর্তে শ্রম, ব্যক্তির বদলে যৌথতা এবং শোষণ ও মুনাফার বিপরীতে সামাজিক প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পিত বণ্টন ব্যবস্থা থাকল না। প্রজাতন্ত্রগুলোর ঐক্যের বস্তুগত ভিত্তি ধ্বসে পড়ল। যার পরিণামে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পতন ছিল অবধারিত। তার সাথে সাথে পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোরও পতন ঘটে। এই সমস্ত দেশগুলো আর নিজেদের সমাজতান্ত্রিক দেশ দাবি করে না। অনেক দেশেই নিজেরাই কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে দিয়েছে। বলা বাহুল্য যে, শ্রমিকশ্রেণির আন্তর্জাতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সব ঘটনা বিশ্বপরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে নিজেরাই ঘোষণা দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিলোপ করে দেওয়ার প্রক্রিয়ার বাইরে ব্যতিক্রম হিসাবে কয়েকটি দেশ আছে। বর্তমান সময়ে পাঁচটি মাত্র এমন রাষ্ট্র আছে যারা নিজেদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শনকে তাদের রাজনৈতিক দর্শন বলে খাতা-কলমে স্বীকার করে। এই সমস্ত দেশগুলোতে ঘোষণা করে কমিউনিস্ট পার্টিকে ভেঙে দেওয়া হয়নি। এই সমস্ত দেশগুলোতে এখনও কমিউনিস্ট পার্টি আছে, নিয়মিত কংগ্রেস হয়, দলিল গ্রহণ করে এবং সেইভাবে দেশকে পরিচালিত করে। এই দেশগুলো হলো চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া এবং লাওস। আলোচনা সাপেক্ষে যদি স্বীকার করে নেওয়াও হয় যে, এই সমস্ত দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদসম্মত চরিত্র অক্ষুন্ন রেখেছে, তবুও একথা বলাই চলে যে, সোভিয়েত ও পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পতনের পর এক কথায় গোটা সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা আর আগের মতো নিয়ামক শক্তি হিসাবে নেই। তবু, আমরা মনে করি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচার করতে গিয়ে এক সময় বিপ্লবের মাধ্যমে যে সমস্ত দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং আজও যারা নিজেদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে দাবি করে, পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মতো মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে অস্বীকার করেনি তাদের সম্পর্কে একটা মূল্যায়ন করা অবশ্যই প্রয়োজন।

যে প্রশ্নটি বিবেচনার দাবি রাখে তা হলো যে সমস্ত দেশ একসময় বিপ্লবের পর

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং এখনো যারা নিজেদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুসারী সমাজতান্ত্রিক দেশ বলে ঘোষণা করে তাদের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা কতটা সমাজতান্ত্রিক? সেই সমস্ত দেশ কি সত্যি সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হচ্ছে? তারা কি সত্যি সমাজতন্ত্র নির্মাণের কৌশল হিসাবে যে পথ গ্রহণ করেছে সেইগুলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল নীতিগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? এই দেশগুলোর উপস্থিতি কি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে অতীতের মতো কোন নিয়ামক দ্বন্দ্বের ভূমিকায় আছে?

চীন

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একসময় ঘোষণা করেছিল —

> ১৯৪৯ সালে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও সেতুং এর নেতৃত্বে সশস্ত্র এবং অন্যান্য আকারে দীর্ঘ, কষ্টসাধ্য এবং কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর চীনা জনগণ অবশেষে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী শাসনকে উৎখাত করে, নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে মহান বিজয় লাভ করে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবেই চীনা জনগণ ক্ষমতা অর্জন করেছিল এবং তাদের নিজের দেশের চালক হয়ে উঠেছিল।
>
> গণপ্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর, চীন ধীরে ধীরে একটি নয়া-গণতান্ত্রিক সমাজ থেকে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে তার উত্তরণ অর্জন সম্ভব করেছে। উৎপাদনের হাতিয়ারের ব্যক্তিগত মালিকানার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সম্পন্ন হয়েছে, মানুষ দ্বারা মানুষের শোষণের ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে এবং শ্রমিক ও কৃষকদের জোটের ভিত্তিতে জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, যা মূলত প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব, সুসংহত ও বিকশিত হয়েছে।
>
> (In 1949, after engaging in protracted, arduous and tortuous struggles, armed and in other forms, the Chinese people of all ethnic groups led by the Communist Party of China with Chairman Mao Zedong as its leader finally overthrew the rule of imperialism, feudalism and bureaucrat-capitalism, won a great victory in the

New Democratic Revolution, and founded the People's Republic of China. The Chinese people thus secured power and became masters of their own country.

After the founding of the People's Republic of China, our country gradually achieved the transition from a new democratic society to a socialist society. The socialist transformation of private ownership of the means of production has been completed, the system of exploitation of man by man abolished, and a socialist system established. The people's democratic dictatorship led by the working class and based on an alliance of workers and peasants, which in essence is a dictatorship of the proletariat, has been consolidated and developed.' - Constitution Of the Communist Party of China, Adopted at the Fifth Session of the Fifth National People's Congress and promulgated by the Announcement of the National People's Congress on December 4, 1982; Preamble, p-2)

তাহলে, ঘোষণা মতে বিপ্লবের পর একসময় চীন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক স্থাপনে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু, আজ বিশ্বের সকলেই জানেন যে, সেই চীন মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের নাম নিয়েই 'সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি'র-নতুন এক ধারণা নিয়ে এসেছে এবং ঘোষণা করেছে যে, তাদের এই তত্ত্ব হলো নতুন যুগে চৈনিক বিশেষত্বের প্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার তত্ত্ব ('the theoretical system of socialism with Chinese characteristics for a New Era')। এর আওতায় একে একে শেয়ার বাজারের প্রবর্তন, ব্যক্তিপুঁজি বিনিয়োগের অধিকার, কমিউন ব্যবস্থাকে বাতিল করে চুক্তি ও লিজ প্রথা চালু করা, এসইজেড (Specilaised Econimic Zone) চালু করে বিদেশি পুঁজির জন্য চীনের দরজা খুলে দেওয়া ইত্যাদি পুঁজিবাদী বিকাশ প্রণোদনাকে উৎসাহিত করার কাজ শুরু হয়। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তি সম্পত্তি রক্ষা রাষ্ট্রের অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব বলে ঘোষণা করা হয়েছে ('Citizens' lawful private property is inviolable' – Article 13 of the Constitution of PRC)। এই নিশ্চয়তা দানের মধ্য

দিয়ে শ্রম শোষণকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের প্রসারের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে সংশোধনবাদী দেং জিয়াও পিং এবং তার পরবর্তী সময়ে জিয়াং জেমিনের নেতৃত্ব চীনের অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব দাবি করে যে, তাদের বর্তমান সমস্ত কর্মসূচি, নীতি, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি মাও সে-তুংয়ের চিন্তাধারার অনুসারী, যদিও চীনের বর্তমান নেতৃত্ব যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মর্মবস্তুর সাথে অনেক অসঙ্গতি তৈরি করেছে তা নিয়ে কোন সংশয় আজ আর নেই। ইতিমধ্যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সর্বশেষ কংগ্রেস (১৯তম জাতীয় কংগ্রেস) ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে দলের গঠনতন্ত্রে সংশোধন এনে ষোড়শ কংগ্রেসে গৃহীত দলের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করে নতুন পথনির্দেশক আদর্শ (a new guiding ideology) ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে অন্যান্য মতধারার সাথে 'নতুন যুগের চীনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত শি জিনপিং-এর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা' — কে অন্যতম আদর্শ হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে:

> চীনের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, মাও সে-তুং এর চিন্তাধারা, দেং জিয়াও পিং তত্ত্ব, তিন প্রতিনিধির তত্ত্ব, উন্নয়ন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং নতুন যুগের জন্য চীনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত সমাজতন্ত্রের উপর শি জিন পিং-এর চিন্তাধারাকে কর্মের নির্দেশিকা হিসাবে অনুসরণ করে। (The Communist Party of China uses Marxism-Leninism, Mao Zedong Thought, Deng Xiaoping Theory, the Theory of Three Represents, the Scientific Outlook on Development, and Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era as its guides to action.)

একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় প্লেনারি সেশনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, মাও সে-তুং চিন্তাধারার পাশাপাশি দেং জিয়াও পিং-এর তত্ত্ব পার্টির 'গাইডলাইন' হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। 'তিন প্রতিনিধির তত্ত্ব' হলো জিয়াং জেমিনের তত্ত্ব যা তিনি ২০০০ সালে বলেছিলেন এবং ত্রয়োদশ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ প্লেনারি সেশনে তা সংবিধানে 'গাইডলাইন' হিসাবে যুক্ত হয়েছিল। জিয়াং জেমিন

বলেছিলেন যে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তিনটি ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করে। (১) এটি উন্নত উৎপাদনশীল শক্তির বিকাশের প্রবণতাকে প্রতিনিধিত্ব করে। (২) এটি একটি উন্নত সংস্কৃতির অভিযোজন প্রতিনিধিত্ব করে। (৩) এটি চীনের সিংহভাগ জনগণের মৌলিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। খেয়াল করার বিষয় যে, সর্বহারা শ্রেণির দলকে এই তিন ধারার প্রতিনিধি বলার মধ্য দিয়ে মূলত লেনিন বর্ণিত সর্বহারা দলের শ্রেণিচরিত্রের মর্মবস্তুকেই পাল্টে ফেলা হয়েছে। দলের এই সংজ্ঞা দেওয়ার কারণেই জেমিনের পক্ষে এমন প্রস্তাব দেওয়া সম্ভব হয়েছিল যে, চীনের পার্টির নেতৃত্বে পুঁজিপতিদেরও স্থান দিতে হবে। অথচ লেনিন একটি কমিউনিস্ট পার্টিকে বলেছিলেন 'vanguard detachment' of the class'।

আবার, 'উন্নয়ন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি' বাক্য-বন্ধটি যুক্ত হয় হু জিন তাও-এর প্রাসঙ্গিকতা বোঝাতে, যা যুক্ত হয়েছিল ষোড়শ কংগ্রেসে। সর্বশেষে উনবিংশ কংগ্রেসে শি জিন পিং এর মতধারা যুক্ত হলো। দেং-এর তত্ত্বকে দলের গাইড-লাইন হিসাবে রেখে দেওয়ার অর্থ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ককে ভেঙে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক মেনে চলা। তেমনি, জিয়াং জেমিনের 'তিন প্রতিনিধি'-র তত্ত্বকে এখনো দলের গাইড-লাইন হিসাবে রেখে দেওয়ার অর্থ সর্ব শ্রেণির সমন্বয়ের তত্ত্বকেই দলের আদর্শ হিসাবে রেখে দেওয়া। তাই, দেং জিয়াও পিং, জিয়াং জেমিন, হু জিন তাও এবং শি জিন পিং এদের প্রত্যেকের চিন্তার পার্থক্য ও মৌলিকত্ব আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। কারণ সবগুলোকেই দেং-এর সংশোধনবাদী ধারার একই সমীকরণের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

চীনের সর্বশেষ কংগ্রেসে সংশোধিত পার্টির সংবিধানে সাধারণ কর্মসূচিতে (General Programme) দেং জিয়াও পিং-এর তত্ত্বের ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয়েছে —

> চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ১১তম কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর, চীনা কমিউনিস্টরা তাদের আদর্শস্থানীয় প্রধান প্রতিনিধিত্বকারী কমরেড দেং জিয়াওপিং-এর নেতৃত্ব, গণপ্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিকগুলো বিশ্লেষণ করেছেন, ঘটনা থেকে সত্যকে খুঁজতে মনকে বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। তারা সমগ্র পার্টির কর্মকাণ্ডের অভিমুখ অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে সন্নিবিষ্ট করেন এবং সংস্কার ও অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করার সূচনা করেন, যার ফলে সমাজতন্ত্রে উন্নয়নের একটি নতুন যুগের সূচনা হয়; তাঁরা ধীরে ধীরে চীনা বৈশিষ্ট্যের সাথে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য লাইন, নীতি এবং কর্মপন্থা প্রণয়ন করেন,

> চীনে সমাজতন্ত্র নির্মাণ, সুসংহতকরণ এবং বিকাশের মৌলিক প্রশ্নগুলির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন এবং এইভাবে চীনের কমিউনিস্টরা দেং জিয়াও পিং-এর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

দেং-এর সেই তত্ত্বের মূল কথা কি? বাজার অর্থনীতি এবং ব্যক্তিগত পুঁজির উদ্যোগকে — জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিসর দিতে হবে। তাঁর কথা ছিল —

> সংস্কার বা বাজারের জন্য অর্থনীতি উন্মুক্তকরণ কোনোটাই ভুল নয়। চীন যেন আর কখনো বন্ধ দরজার দেশে পরিণত না হয়। নেতৃত্বকে অবশ্যই পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং বাজার অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করতে হবে। এই নীতিতে কোনো পরিবর্তন করা চলবে না।

এই সমন্বয় সাধনের অর্থ হলো সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক যেটুকু গড়ে উঠেছিল তাকে বুর্জোয়া উৎপাদন সম্পর্ক দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা। পরিকল্পিত অর্থনীতির যতটুকু ভিত্তি গড়ে তোলা হয়েছিল তাকে ভেঙে ফেলে সেখানে ব্যক্তি পুঁজির মুনাফাভিত্তিক নৈরাজ্যকে ডেকে আনা। দেং পরবর্তী যাদের মতধারা পার্টি গাইড-লাইন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে — জিয়াং জেমিন, হু জিন তাও এবং শি জিন পিং — তাঁরা প্রত্যেকেই সেই একই সংস্কার ও উন্মুক্ত অর্থনীতির ভিত্তিতে চীনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিকাশের কথা বলছেন। মতাদর্শগত দিক থেকে যা দেং-এর চিন্তাধারার সঙ্গে কোন মৌলিক পার্থক্য সূচিত করে না। যে কারণে কীসের ভিত্তিতে এদের প্রত্যেকের মতধারা স্বতন্ত্র, মৌলিক ও স্বাধীন মতবাদ আকারে পার্টির গাইড-লাইন হিসাবে যুক্ত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও পার্টির গাইড-লাইন হিসাবে এতজনের নামকে যে অন্তর্ভুক্ত করতে হচ্ছে, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, এদের প্রত্যেকের অনুসারীদেরই দলের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব আছে এবং এই সমস্ত গ্রুপগুলোকে খুশি রাখার জন্য, তাদের মধ্যে সমঝোতার জন্য সকলের নামকে যুক্ত করতে হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে চীন, চীনাপণ্য ও চীনা-পুঁজির বিশ্ববাজার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র হিসাবে প্রভাব বলয় সম্প্রসারণের জন্য সামরিক ও কূটনৈতিক তৎপরতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। সেই দিক থেকে আমাদের জানামতে চীনের সাথে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের দ্বন্দ্বের উৎস এটা নয় যে, চীন শ্রমিকশ্রেণির আন্তর্জাতিক কোন দায়িত্ব পালন করছে বলে বা বিশ্ব-সাম্যবাদী আন্দোলনকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে বলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে। তাই বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার মধ্যে এই বিরোধের ব্যাখ্যা পাওয়া

যাবে না। বরং পুঁজি ও পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লড়াই হলো চীন ও আমেরিকার বিরোধের কারণ। চীনের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি যে বিশ্ব-সাম্যবাদী আন্দোলনকে সহায়তা ও নেতৃত্বদানের জন্য নয় বরং সস্তায় কাঁচামাল ও শ্রমের অন্বেষণ এবং নিজের পণ্যের জন্য বাজার নিশ্চিত করার উদ্যোগ তা অনেকাংশে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বলা চলে যে, সামরিক শক্তি প্রয়োগ ও যুদ্ধ রপ্তানি করার মতো রাস্তায় চীন এখন পর্যন্ত না হাঁটলেও (যদিও ১৯৭৯ সালে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে গণচীন যুদ্ধ অভিযান করেছিল) অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মতো মুনাফা অর্জন, পুঁজি লগ্নি করা, বিশ্বব্যপী কাঁচামাল লুণ্ঠনের জন্য সামরিক শক্তি ও ক্ষমতার বলয়বৃদ্ধির ঝোঁক প্রকাশ্যেই দেখা যাচ্ছে। কাজেই, 'চৈনিক চরিত্রের সমাজতন্ত্র' গঠনের এই কৌশল ও পথ যে মার্কসবাদসম্মত তা দুনিয়ার অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টি আজ আর স্বীকার করে না।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ইউরোপের কোনো কোনো দেশে নতুন করে যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো গড়ে উঠছে তাদের কোনো কোনো সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে পার্টির সরকারি লাইনের বিরুদ্ধে কিছু কিছু বিরোধিতা আছে। জনগণের মধ্যেও কমরেড মাও-এর প্রভাব আছে। যে কারণে, পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলোতে বা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলোতে পতনের পরই যেভাবে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই লেনিন, স্ট্যালিনের মূর্তি ভেঙে ফেলতে পেরেছে, দেং জিয়াও পিং-এর নানা রকম প্ররোচনা সত্ত্বেও চীনে তেমনভাবে কমরেড মাও-কে অপসারিত করা সম্ভব হয়নি। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বশেষ যে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে পার্টি শুধুমাত্র দেং বা শি জিন পিং-এর মতধারা অনুযায়ী চলবে এমন উচ্চারণ করতে পারেনি, মাও-এর চিন্তাধারাকেও অনুসরণ করবে বলে এখনো বলতে হচ্ছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চীনের পার্টির গাইড-লাইন হিসাবে যে এতজনের নাম রাখতে হচ্ছে তা প্রমাণ করে যে, দলের অভ্যন্তরে গাইড-লাইন নিয়ে নানা মত ও বিরোধ আছে। এই বিরোধ শেষ পর্যন্ত কী ফলাফল আনবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না এবং এর চূড়ান্ত পরিণাম দেখার জন্য হয়ত আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। একথা সত্যি যে, চীন পুঁজিবাদের যে পথে হাঁটছে তার জন্য পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের কারণে সংকট চীনেও আসা অবশ্যম্ভাবী এবং সেই সংকট এইসমস্ত মতবিরোধকে তীব্র করে তুলবে তা বলাই যায়। সংকটে ভেঙে পড়ার সময় চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে এই সমস্ত কমরেডদের অগ্রসর অংশ ক্ষুদ্র হলেও হয়ত চীনের শ্রমিকশ্রেণি গ্রামীন কৃষকদের সাথে নিয়ে

কার্যকর বিপ্লবী ভূমিকা পালন করতে পারে। এটা আশাবাদের মতো শোনালেও শ্রমিকশ্রেণি সব সম্ভাবনাগুলোকে উপেক্ষা করতে পারে না এবং যত প্রতিকূল পরিস্থিতি হোক শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণি-সচেতনতার কার্যকারিতাকে অস্বীকার করা যায় না। চীনের শ্রমিকশ্রেণি নিশ্চিতভাবে একদিন সংশোধনবাদ ও তার চূড়ান্ত পরিণতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

ভিয়েতনাম

ভিয়েতনামও নিজেদের সমাজতান্ত্রিক দেশ বলে দাবি করে। চীনের তুলনায় ভিয়েতনাম আয়তন, জনসংখ্যা, সম্পদ ইত্যাদি সমস্ত বিবেচনাতেই অনেক ছোট দেশ। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী লড়াই শেষে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজও শুরু হয়েছে চীনের থেকে অনেক পরে। সমাজতন্ত্র নির্মাণের সামনে ভিয়েতনামকে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার চরিত্র চীনের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। চীন ১৯৪৯ সালে বিপ্লব সম্পন্ন করার পরে প্রায় ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত পরিকাঠামো নির্মাণে তৎকালীন সোভিয়েতের কাছ থেকে কারিগরী দক্ষতা, প্রযুক্তি, জ্ঞান (knowledge) ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা পেয়েছিল। কিউবা একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র হয়েও সমাজতন্ত্র গঠনের পথে সেই সময়ের সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সহায়তা পেয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ভূমিকা মোকাবিলা করতে তৎকালীন সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ও গণচীনের বলিষ্ঠ সমর্থন পেয়েছে। ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে সেই সুযোগ ছিল না এবং ১৯৭৯ সালেই চীনের সাথে যুদ্ধের ঘটনা ঘটে যাওয়া মতো বৈরীতার পরিবেশ তৈরি হলে সমস্যা আরও গভীর হয়ে ওঠে। কয়েক দশক ধরে উপনিবেশ হিসাবে প্রথমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ফ্রান্স এবং পরে আমেরিকার সাথে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব মরণপণ যুদ্ধে জয়ী হলেও সমাজতন্ত্র গঠনের পরিবেশ ও সাহায্য-সহযোগিতার বিচারে দুর্লঙ্ঘনীয় প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। এমনিতেই দেশটি ছিল কৃষিঅর্থনীতি নির্ভর পিছিয়ে পড়া দেশ। তদুপরি, দীর্ঘ কয়েক দশকের উপনিবেশিকতা বিরোধী হিংস্র যুদ্ধের দগদগে ঘা নিয়ে বিধ্বস্ত এবং তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র ও সম্পদহীন জনপদে সমাজতন্ত্র গঠনের কর্মসূচি ছিল স্পর্ধাজনক (challenging)। শুরুতেই চীনের সাথে বিরোধের কারণে সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনাম হয়ে পড়ে একা, সহযোগীবিহীন।

আমরা জানি কোন একটি দেশে এককভাবে সমাজতন্ত্র গঠন করা যাবে কিনা তাই নিয়ে বিশ্ব-সাম্যবাদী আন্দোলনে লেনিনের সময় থেকেই বিতর্ক ছিল। সোভিয়েত বিপ্লব হওয়ার পরেও নানা শঙ্কা ছিল এবং এই বিষয়ে বিতর্ক অব্যাহত ছিল।

রাশিয়ার মতো দেশে কেন এককভাবে সমাজতন্ত্র গঠন সম্ভব হতে পারে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্ট্যালিনের যুক্তি জানা থাকলে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির কাছে কাজটি যে খুব সহজ নয় তা অনুধাবন করা কঠিন ছিল না। স্ট্যালিন বলেছিলেন —

> প্রথমে আমাদের স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, কোন কোন শর্ত বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে রাশিয়ার অস্তিত্ব ও বিকাশ নিশ্চিত করবে। এই শর্তগুলো দুই ধরনের : কতগুলো অপরিবর্তনীয় যা আমাদের উপর নির্ভর করে না; অন্যটি পরিবর্তনীয় (variable), কারণ সেগুলো মানুষের উপর নির্ভরশীল।' প্রথম ধরনের শর্ত হিসাবে তিনি দুইটি যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন। এর একটি হলো যে, 'রাশিয়া একটি অত্যন্ত বড় ও অসীম ভূখণ্ড (vast and boundless land), যে কারণে বিপর্যয়ের সময়ে পিছিয়ে গিয়ে দেশের অভ্যন্তরে দীর্ঘ সময় আশ্রয় নিয়ে নিজেদের রক্ষা করা যায় এবং নতুন করে আক্রমণ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করা যায়। রাশিয়া যদি ছোট দেশ হতো, হাঙ্গেরির মতো, যেখানে কোন শক্তিশালী শত্রুর অতর্কিত আক্রমণের মুখে আত্মরক্ষার জন্য কসরতের সুযোগ কম, কোথাও আশ্রয় নেওয়ার জায়গাও নেই, তেমন অবস্থায় দীর্ঘ সময় ধরে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করা দুরূহ হতো। (স্ট্যালিন ওয়ার্কস-৪, পৃ-৩৮৮)

অন্য যেটি রাশিয়ার অনুকূল বলে তিনি ব্যাখ্যা করেন তা হলো—

> রাশিয়া বিশ্বের সেই স্বল্পসংখ্যক কয়েকটি দেশের মধ্যে অন্যতম যেখানে সবধরণের জ্বালানি, কাঁচামাল এবং খাদ্যের প্রাচুর্য আছে — এর অর্থ হলো, রাশিয়া এমন একটি দেশ যা জ্বালানি, খাদ্য ইত্যাদির জন্য বিদেশি দেশগুলির উপর নির্ভরশীল নয়, যে কারণে এই সব বিষয়ে বাইরের বিশ্বকে বাদ দিয়ে সে চলতে পারে। সন্দেহ নেই যে, যদি রাশিয়া শস্য এবং জ্বালানির জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল হতো, যেমন ইতালি, তবে বিপ্লবের পরদিনই তাকে সংকটজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হতো। (স্ট্যালিন ওয়ার্কস-৪, পৃ-৩৯৮)

ভূখণ্ডের আয়তনের বিচারে হোক বা উপাদান হিসাবে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সহজপ্রাপ্যতা হোক এই অনুকূল বাস্তবতা ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে ছিল না। অর্থাৎ একটি দেশে এককভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম রাখতে রাশিয়ার ক্ষেত্রে স্ট্যালিনের দেওয়া শর্তের কোনটাই ভিয়েতনামের কাছে সত্য ছিল না। সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতার মুখে বৈরী পরিবেশে সমাজতন্ত্র গঠন তাই সহজ

কাজ ছিল না। সমাজতন্ত্রের যথার্থ পথ নিয়ে তাই তাদেরকে ভাবতে হয়েছে। ১৯৮৬ সাল থেকে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায় অর্থনৈতিক পুনর্গঠন বা সংস্কারের ('Doi Moi') যে পথ তাঁরা বেছে নিয়েছেন তা আদৌ সমাজতন্ত্রের পথ কিনা তা নিয়ে বিশ্বের কমিউনিস্টদের কাছে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। অনেকেই ভিয়েতনামকে চীনের মতো বিচারে আর সমাজতান্ত্রিক দেশ বলে স্বীকার করতে চান না। কিন্তু, সিদ্ধান্ত করার আগে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান ও যুক্তি বোঝাটা আমাদের কাছে জরুরি — অর্থাৎ আমাদের যাদের কয়েক দশক ধরে দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়ে একটি পিছিয়ে পড়া কৃষিনির্ভর দেশে প্রবল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এককভাবে একটি দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণের অভিজ্ঞতা নেই।

গত বছর ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাদের কংগ্রেসের দলিলে বিশ্বের পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির কড়া সমালোচনা করা হয়েছে, কিন্তু একই সাথে 'সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি' ('socialist-oriented market economy') অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই দুইয়ের মধ্যে অনেকেই অসামঞ্জস্যতা খুঁজে পেয়েছেন এবং সমাজতন্ত্রের পথ ছেড়ে 'পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পন' বলে মনে করেছেন। ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের বিচার-বিশ্লেষণের ব্যাখ্যা হিসাবে বেশ কিছু নতুন ধারণা সংযোজিত করেছেন। যেমন, তাঁরা বলতে চান যে, পুঁজিবাদ মাত্রই বাজার অর্থনীতি থাকবে, কিন্তু বাজার আছে মানেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এমন ধারণা ঠিক নয়।

পার্টি কংগ্রেসের দলিলে দলের সাধারণ সম্পাদকের লেখা প্রবন্ধে ('Some theoretical and practical issues on socialism and the path towards socialism in Vietnam.') উল্লেখ করা হয়েছে —

> সমাজতন্ত্র কী এবং কীভাবে আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হব? এই প্রশ্ন নিয়েই আমরা সর্বদা চিন্তা করছি, আলোচনা-বিতর্ক করছি, আমাদের পথ-নির্দেশ এবং দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে উন্নত করার জন্য গবেষণা এবং তুলনামূলক বিচার করে চলেছি, এবং সেগুলো বাস্তবায়ন সংগঠিত করছি, যাতে আমরা একই সাথে সাধারণ নিয়ম পালন করতে পারি এবং ভিয়েতনামের বিশেষ শর্ত পূরণ করতে পারি।

এরপর তাদের উপলব্ধির বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন —

সংস্কারের (Doi Moi) বছরগুলিতে, অনুশীলনের পর্যালোচনা এবং তত্ত্বের অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করে, ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের আরও সম্পূর্ণ এবং গভীর উপলব্ধিতে পৌঁছেছে। আমাদের পূর্বে যে সমস্ত সরল ধারণাগুলি ছিল সেইগুলিকে আমরা পর্যায়ক্রমে বিবেচনা করেছি। এদের কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, বর্তমানে হাতে থাকা কাজটির সাথে সমাজতন্ত্রের শেষ লক্ষ্যকে এক করে ফেলা (homogenizing), রূপান্তরকালে (transition state) উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি না করেই একতরফাভাবে উৎপাদন সম্পর্ক ও সমবণ্টনের উপর জোর দেওয়া, অন্যান্য অর্থনৈতিক খাতের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি না দেওয়া, বাজার এবং পুঁজিবাদকে একাসনে বসানো এবং আইনের শাসন দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মতোই দেখা।

[During the years of Doi Moi, based on the review of praxis and study of theory, the Communist Party of Viet Nam has been gradually reaching a more complete and profound understanding of socialism and the transition into socialism. We have in stages addressed simplistic ideas we held previously, such as homogenizing the end goal of socialism with the task currently at hand, one-sidedly stressing production relations and equal distribution without fully realizing the need to develop the productive force in the transition period, not recognizing the existence of other economic sectors, putting the market economy in the same basket as capitalism, and viewing the rule-of-law state as the same as a bourgeois state, just to name a few.-'Some theoretical and practical issues on socialism and the path towards socialism in Vietnam.']

অর্থাৎ, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক ও সমবণ্টনের নীতি প্রতিষ্ঠিত করা যে শুধুমাত্র ঘোষণা দিয়ে হবে না, তা যে উৎপাদিকা শক্তির একটা পর্যায় পর্যন্ত বিকাশের উপর নির্ভরশীল সে কথা তাঁরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছেন। এই উপলব্ধির সাধারণ সত্যতা সম্পর্কে আমাদের কোন বিরোধ নেই। এই

কারণেই, সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক কাজের সাথে শেষ লক্ষ্যের যে পার্থক্য সূচিত করেছেন তার সাথেও আমরা দ্বিমত করি না। এর পর যে গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধির কথা বলেছেন তা হলো — তাঁরা বলতে চাইছেন যে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বাজার থাকবেই, কিন্তু বাজার থাকলেই তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হয় না। আমরা জানি এই একই সমস্যা এবং প্রশ্ন কমরেড লেনিনের সামনেও রাশিয়ার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় এসেছিল এবং এই প্রসঙ্গে লেনিন যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন তার সাথে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির উপলব্ধি ও সিদ্ধান্তের আপাতদৃষ্টিতে কোন বিরোধ নেই। ১৯২২ সালে নভেম্বর মাসে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেসে লেনিন তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার অর্থনীতির উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করে বলেছিলেন —

> 'আমার মতে এই উপাদানগুলো হলো নিম্নরূপ : '(১) পিতৃতান্ত্রিক, অর্থাৎ, কৃষির সবচেয়ে আদিম রূপ; (২) ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন (এর মধ্যে অধিকাংশ কৃষক যারা খাদ্যশস্যের বাণিজ্য করে); (৩) ব্যক্তি পুঁজিবাদ; (৪) রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ এবং (৫) সমাজতন্ত্র।' [In my opinion these elements were the following: '(1) patriarchal, i.e., the most primitive form of agriculture; (2) small commodity production (this includes the majority of the peasants who trade in grain); (3) private capitalism; (4) state capitalism, and (5) socialism.']

অর্থাৎ, সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রের উপাদানের সাথে ব্যক্তি পুঁজিবাদ তো বটেই, এমন কি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের অস্তিত্বকে একটা পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে চলতে হয়। ভিয়েতনামের মতো পিছিয়ে থাকা ও যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির দেশেও কৃষির সবচেয়ে আদিম রূপ, ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন এবং খাদ্যশস্যের বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল অধিকাংশ কৃষক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য নিয়েই ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ শুরু করেছিল। ক্ষুদ্রপুঁজি হিসাবে টিকে থাকা ব্যক্তিপুঁজিকে সম্পূর্ণভাবে উৎপাটন সোভিয়েত রাশিয়ায় স্ট্যালিনের জীবদ্দশাকালীন সময় পর্যন্ত সম্ভব হয়নি — সেই কথা আমরা জানি। কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সফলভাবে সমাপ্ত করার পর শুধুমাত্র 'উৎপাদনের হাতিয়ার' (means of production) ক্ষেত্রটিতে (sector) পণ্য-বাজার নির্মূল করে অর্থনীতির এবং পণ্য-বাজারের এক অংশে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের অবসান ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের স্তরকে ক্রমান্বয়ে নিঃশেষিত করে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক স্থাপনে জয়ী হওয়ার

অর্থ হলো রাষ্ট্রের অধীনে উৎপাদিত দ্রব্যকে বাজারের পণ্য সঞ্চালন প্রক্রিয়ার বাইরে নিয়ে আসা। স্ট্যালিনের জীবদ্দশায় ভোগ্য-পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র সেই স্তর তখনও অর্জন করতে পারেনি। এর অর্থ হলো ব্যক্তি পুঁজি থাকায় বাজার তো ছিলই, এমনকি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধীনে উৎপাদিত দ্রব্যও পণ্য হিসাবে বাজার ব্যবস্থায় উপস্থিত ছিল। এ কথা সকলের জানা যে, বিপ্লবের পরে সোভিয়েত পার্টিতে সেই সময় এই রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ নিয়ে প্রবল বিতর্ক ছিল।

সেই বিতর্ক প্রসঙ্গে বলশেভিক পার্টির একাদশ কংগ্রেসে পার্টির রাজনৈতিক রিপোর্টে লেনিন বলেছিলেন –

> 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের (state capitalism) প্রশ্নে, আমি মনে করি যে সাধারণত আমাদের প্রেস এবং আমাদের পার্টি বুদ্ধিবৃত্তিবাদ, উদারনীতিতে নিমজ্জিত হওয়ার মতো ভুল করে; রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সে সম্পর্কে আমরা দর্শন কপচাই এবং পুরানো বইগুলিতে উত্তর খুঁজি। কিন্তু সেই পুরানো বইগুলিতে আমরা যা আলোচনা করছি তা আপনি পাবেন না; সেখানে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ নিয়ে যে আলোচনা থাকে তা পুঁজিবাদের অধীনে। সাম্যবাদের অধীনে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ নিয়ে একটিও বই লেখা হয়নি। এই বিষয়ে একটা শব্দ লেখাও মার্কসের কাছে প্রয়োজন মনে হয়নি; এবং তিনি এই বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট বক্তব্য বা নির্দিষ্ট নির্দেশনা ছাড়াই মারা যান। সেজন্য এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পূর্ণভাবে আমাদেরকেই ঠিক করতে হবে।' (লেনিন, রচনাবলি, খণ্ড-৩৩, পৃ-২৭৭-৭৮) [On the question of state capitalism, I think that generally our press and our Party make the mistake of dropping into intellectualism, into liberalism; we philosophise about how state capitalism is to be interpreted, and look into old books. But in those old books you will not find what we are discussing; they deal with the state capitalism that exists under capitalism. Not a single book has been written about state capitalism under communism. It did not occur even to Marx to write a word on this subject; and he died without leaving a single precise statement or definite instruction on it. That is why we must overcome the difficulty entirely

by ourselves.] যাঁরা বিরোধ করছিলেন তাদের বক্তব্য ছিল 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ'-কে তো একমাত্র পুঁজিবাদ বলেই ব্যাখ্যা করা যায়। লেনিন এই ব্যাখ্যাকে বলেছিলেন 'pure scholasticism'।

এই একাদশ কংগ্রেসেই কমরেড লেনিন তারপর ব্যাখ্যা করেছিলেন একটি সীমা পর্যন্ত পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদের পণ্য বিনিময়ের ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েই এগোতে হবে।

> ইতিহাসে আগে কখনও এমন পরিস্থিতি দেখা যায়নি যেখানে সর্বহারা শ্রেণি, বিপ্লবের অগ্রগামী বাহিনী, পর্যাপ্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে এবং তার পাশে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদও বিদ্যমান আছে। পুরো প্রসঙ্গটি আমাদের এই উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায় যে, এটা হলো সেই রকম পুঁজিবাদ যাকে আমরা মেনে নিতে পারি এবং অবশ্যই অনুমতি দিতে পারি, একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এই পুঁজিবাদকে আমরা গণ্ডিবদ্ধ করতে পারি এবং আমরা তা অবশ্যই করব; এই পুঁজিবাদ হলো ব্যাপক অংশের কৃষকের জন্য এবং ব্যক্তিগত পুঁজির জন্য অপরিহার্য, যার সাথে এমনভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে যাতে কৃষকদের চাহিদা মেটাতে পারে। আমাদের অবশ্যই এমনভাবে ব্যবস্থাটিকে সংগঠিত করতে হবে যাতে পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং পুঁজিবাদী বিনিময় তার প্রথাগত কাজ কর্ম করতে পারে, কারণ এটি জনগণের জন্য অপরিহার্য। অন্যথায়, আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। (লেনিন, রচনাবলি, খণ্ড-৩৩, পৃ-২৭৯)
>
> [Never before in history has there been a situation in which the proletariat, the revolutionary vanguard, possessed sufficient political power and had state capitalism existing alongside it. The whole question turns on our understanding that this is the capitalism that we can and must permit, that we can and must confine within certain bounds; for this capitalism is essential for the broad masses of the peasantry and for private capital, which must trade in such a way as to satisfy the needs of the peasantry.]

লেনিনের এই ব্যাখ্যা জানা থাকলে অন্তত এইটুকু বোঝার কোন অসুবিধা নেই যে সমাজতন্ত্র পুনর্গঠনের পর্যায়ে কোন কোন ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক

বজায় রেখে পণ্য বিনিময় ও বাজারের অবস্থানকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বগতভাবে লেনিনবাদ বিরোধী কিছু নেই।

কার্ল মার্কস 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার'-এ বলেছিলেন যে —

> মানুষ নিজের ইতিহাস নিজেই তৈরি করে, কিন্তু তাঁরা তাদের ইচ্ছামতো তা তৈরি করতে পারে না; পরিস্থিতি তাঁরা নিজেরা বেছে নিতে পারে না, বরং অতীত থেকে আসা এবং পাওয়া যেমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তাকে মোকাবিলা করেই মানুষকে ইতিহাস রচনা করতে হয়।

তাই ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টিকেও তার দেশের ইতিহাস, সম্ভাবনা, প্রতিকূলতা, বাস্তবতা ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই পদক্ষেপ নিতে হয়েছে বা হচ্ছে, ইচ্ছে করলেই উৎপাদিকা শক্তির যথাযথ বিকাশ করার আগেই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক সরকারি ঘোষণার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সর্বশেষ ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেসের (২৫ জানুয়ারি — ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১) দলিলে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড নগুয়েন ফু ট্রং দেশের বর্তমান অর্থনীতির ব্যবস্থার কাঠামোগত অবস্থানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মোট জাতীয় উৎপাদনে মালিকানাভিত্তিক পরিসংখ্যান উল্লেখ করেছেন। মালিকানার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক কাঠামোর চিত্রটি হলো রাষ্ট্রীয় খাত অধিকার করে আছে মোট জিডিপির ২৭ শতাংশ, সমবায় খাত ৪ শতাংশ, পারিবারিক অর্থনীতি ৩০ শতাংশ, অভ্যন্তরীণ বেসরকারি খাত ১০ শতাংশ এবং বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ (FDI) খাত ২০ শতাংশ। একথা সর্বজনবিদিত যে, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ রাতারাতি সম্ভব নয় এবং তার জন্য প্রয়োজন পুঁজির সঞ্চয়ন (accumulation) এবং তার বিনিয়োগ। সোভিয়েতের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা রূপায়নের সময় এই পুঁজি সংগ্রহের সমস্যা কমরেড স্ট্যালিনকেও মোকাবিলা করতে হয়েছিল। মূল প্রশ্ন হলো এই পুঁজি সংগ্রহ হবে কোথা থেকে? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার নিজস্ব উদ্যোগ বজায় রেখেছে, নাকি পুরোটাই বেসরকারি উদ্যোগের উপর ছেড়ে দিয়েছে। 'The Five-Year Socio-Economic Development Plan 2016-2020: Socialist Republic Of Vietnam' রিপোর্টে আছে পূর্বের পাঁচ বছরে গড়ে প্রতিবছর মোট জাতীয় উৎপাদনের ৩১.৭ শতাংশ সামাজিক পুঁজি (social capital) হিসাবে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই বিনিয়োগের ৪১.২ শতাংশ কোন না কোন রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ—রাষ্ট্রীয় বাজেটের অংশ, রাষ্ট্রীয় শিল্পের সঞ্চয় থেকে বিনিয়োগ, সরকারের বন্ড বা ঋণের মাধ্যমে বিনিয়োগ। রাষ্ট্রীয়

বিনিয়োগের এই হার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে পুঁজি সঞ্চয়নের মূল ক্ষেত্র হলো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ থেকে সংগৃহীত উদ্বৃত্ত। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের এই ধারা অব্যাহত রাখতে পারলে ক্রমশ ব্যক্তি উদ্যোগকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা সম্ভব এবং এ ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। ব্যক্তির ক্ষুদ্র সঞ্চয় থেকে বিনিয়োগ– নিজস্ব ঘরবাড়ি নির্মাণ (residential investment) বা ব্যক্তি উদ্যোগের মিলিত অংশ-৩৮.৬ শতাংশ। এই পুঁজি ব্যক্তি পুঁজি হলেও প্রতিটি আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং সেই কারণে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার নজরদারিতে রাখা সম্ভব। FDI থেকে বিনিয়োগের পরিমাণ জিডিপির ১৯.৩ শতাংশ এবং অন্যান্য ২ শতাংশ। জিডিপিতে মালিকানা ভিত্তিক অবদান, বিনিয়োগে মালিকানা ভিত্তিক পুঁজির পরিমাণের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা যথেষ্ট আশাজনক। বর্তমান পরিস্থিতি ইঙ্গিত করে যে, দেশি পুঁজির গরিষ্ঠ অংশ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রাণাধীন ও বিদেশি ব্যক্তি পুঁজির সীমা এখনো দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ে যায়নি। জিডিপির ৩১.৭ শতাংশ সামাজিক পুঁজি বিনিয়োগের ধারা অব্যাহত রাখতে পারলে ব্যক্তিপুঁজির ক্ষেত্র ক্রমশই কমে আসবে। যদিও এই সংস্কারের পথে হাঁটতে গিয়ে ভিয়েতনাম দেশে ৬ জন বিলিয়নিয়ারের জন্ম দিয়েছে এই তথ্য জেনে যে কেউ ভিয়েতনামের পরিণতি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হবেন। ভিয়েতনামের সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়ার এই কৌশলগত অভিজ্ঞতা নতুন। সোভিয়েত রাশিয়া বা পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর পরিণতি দেখে অনেকেই ভিয়েতনাম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করেন এবং হয়তো পরিণতি সম্পর্কে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে বলে আমরাও মনে করি। কিন্তু, সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ে বহুদিন পর্যন্ত ব্যক্তিপুঁজির অস্তিত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে লেনিনের বিশ্লেষণ মনে রাখলে, ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ফেলে দিয়ে পুঁজিবাদী রাস্তায় হাঁটছে তা বলার মতো সময় এখনো হয়তো আসেনি বলেই আমরা মনে করছি। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে উৎপাদিকা শক্তিকে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে অতি স্বল্প রসদ নিয়ে, আধুনিক উৎপাদন কলা-কৌশলের উপযুক্ত প্রযুক্তি ও জ্ঞানের অপর্যাপ্ততার প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার চ্যালেঞ্জ নিয়ে, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে সহযোগিতা গ্রহণের সুযোগের অভাবের মধ্যে সমাজতন্ত্র নির্মাণের এই দুরূহ প্রচেষ্টা এবং তার জন্য যে কৌশলগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁরা ব্রতী হয়েছেন তার ফলাফল দেখার জন্য আমাদের অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে।

লাওস

ভিয়েতনামের পাশেই আর একটি অত্যন্ত ছোট রাষ্ট্র লাওস। চীন, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, মায়ানমার, থাইল্যান্ড দ্বারা চারিদিক পরিবেষ্টিত দেশটির জনসংখ্যা মাত্র ৭৪.২ লক্ষ। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের মদদপুষ্ট রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লাওসের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে লড়াই করে ক্ষমতার বদল ঘটে। লাওসের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো জলবিদ্যুৎ উৎপাদন। বৈদিশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য পার্শ্ববর্তী দেশে বিদ্যুৎ রপ্তানি করা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। লাওসের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার নিজেদেরকে সমাজতান্ত্রিক দেশ বলেই মনে করে। তাদের দেশও অর্থনৈতিক সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ১৯৮৬ সাল থেকে এবং সেই সংস্কার মূলত, ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির পথানুসারী। সংস্কারের নীতি গ্রহণের পর তাদের পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয় —

> সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, আমাদের অবশ্যই জানতে হবে কীভাবে বস্তুগত নিয়ম প্রয়োগ করতে হয় এবং আর্থসামাজিক দক্ষতাকে বিবেচনায় নিতে হয়। বর্তমান সময়ে, আমাদের দেশ এখনও [সমাজতন্ত্রে] উত্তরণের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তাই আমাদের দেশে এখন যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ম প্রয়োগ করা হচ্ছে তা খুবই জটিল। তার মধ্যে শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রের নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, একই সাথে পণ্য উৎপাদনের নিয়মও অন্তর্ভুক্ত আছে। বাস্তবতা ইঙ্গিত দেয় যে, আমরা যদি শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রের নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সূত্রগুলোকে প্রয়োগ করি এবং পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত সাধারণ নিয়মগুলিকে অমান্য করি অথবা উল্টোটা, তাহলে আমরা এই উত্তরণ কালপর্বে আমাদের অর্থনৈতিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে গুরুতর ভুল করব।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘোষণার পরেই সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কৃষিব্যবস্থার ও ব্যক্তিপুঁজির উদ্যোগের বিরুদ্ধে যে সমস্ত নীতি লাওস গ্রহণ করেছিল, ১৯৮৬ সালে পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদক কেসন ফমবিহান (Kaysone Phomvihane)-এর ভাষণের মধ্য দিয়ে সেই অবস্থান থেকে সরে এসে সংস্কারের পথ গ্রহণ করা হয়। একদিক থেকে সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে পুঁজিবাদী বাজার ও পণ্য বিনিময়ের সুযোগ দেওয়া হয়। সহায়-সম্পদ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনসংখ্যা, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, কৃষিজাত উৎপাদিত দ্রব্য ভিন্ন সমস্ত বিষয়ে বর্হিবিশ্বের সহযোগিতা

ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীল অতি ক্ষুদ্র একটি দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে কি না এবং সেই পথের প্রতিবন্ধকতাগুলোর যথার্থ উপলব্ধি ঘটিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব তাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় যথার্থ মার্কসবাদী প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শেষ পর্যন্ত সক্ষম হবেন কিনা তা হয়ত সময়ই বলবে। আমরা আশা করব লাওসের জনগণ, লাওসের কমিউনিস্ট পার্টি এবং অসংখ্য কমরেড এই লড়াইতে জয়যুক্ত হোন।

কিউবা

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কোলঘেঁষে অবস্থিত ছোট্ট দ্বীপ দেশ কিউবা। পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার অন্যতম শরিক দেশটি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র আক্রমণের সামনে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থনৈতিক এবং সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবাকে আক্রমণ করার জন্য প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে চলেছে সমাজতান্ত্রিক কিউবার জন্মলগ্ন থেকে। তারা নানা প্রকারের সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছে। কখনো সাদা পোশাকের গুপ্তচর, কখনো প্রাক্তন হয়ে যাওয়া তথাকথিত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী — সবাইকে কাজে লাগিয়েছে। গসিপ ছড়ানোর জন্য ইউটিউবার থেকে এবং মধ্যম মানের শিল্পী পর্যন্ত সমস্ত ধরণের কিউবার বিরোধীদের প্রশিক্ষণ, পরামর্শ এবং অর্থ সাহায্য দিয়েছে।

গত ৬০ বছর ধরে, আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কীভাবে মার্কিন সরকারগুলো কিউবার বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দখলদারিত্বের প্রচেষ্টায় আক্রমণের হুমকি, সন্ত্রাসী হামলাকে উৎসাহিত করা এবং স্বঘোষিত বা সর্বজনস্বীকৃত খুনিদের সদম্ভে রক্ষা করার ঘোষণা ইত্যাদি কোনকিছু করতেই তারা পিছপা হয়নি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন সরকার গুলো কিউবার জনগণকে সমাজতন্ত্রের পথ বেছে নেওয়ার জন্য চরম শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর এবং সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করতে দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করেছে। সমস্তরকম অবরোধের মুখে, কল্পনাতীত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে বিগত ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশের অগ্রগতিতে জনগণের প্রকৃত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন, সম্পদ ও আয়ের সুষম বণ্টন এবং বৈষম্য হ্রাসের মতো সামাজিক বাস্তবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনকে মার্কিন রাষ্ট্র ক্ষমা করতে পারে না। সমস্ত সামাজিক সূচকে অগ্রসর একটি সমৃদ্ধ, মর্যাদাপূর্ণ এবং টেকসই সমাজ গঠনের বিকল্পের হাতছানি তাদের মূল শিরঃপীড়ার কারণ।

বিপ্লবের পর থেকেই মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শিবির কিউবার অর্থনীতিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার চেষ্টা করছে, দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত জরুরি ও স্বাভাবিক সংযোগগুলো অবরোধ সৃষ্টি করে ও স্যাংশন (বিধিনিষেধ) চাপিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। কিউবার সমাজতন্ত্রকে কালিমালিপ্ত করতে, ইতিহাসকে বিকৃত করতে, কিউবার সীমাবদ্ধতা ও অভ্যন্তরীণ কোন স্বাভাবিক বিবাদকে বড় করে দেখাতে, ঐক্যমতকে ধ্বংস করতে, সমষ্টিগত চেতনাকে দুর্বল করতে, প্রতিদিন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জনমতকে বিভ্রান্ত করতে শত শত মিথ্যা গল্পের জন্ম দিয়ে চলছে।

অবরোধের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সেক্টরগুলোর অসন্তোষ ব্যবহার করে তারা দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করেছে। তারা উৎসাহের সাথে জাল অ্যাকাউন্ট তৈরি করে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে পরিচালিত রোবট ব্যবহার করে, ভুয়া নিউজ চ্যানেল এবং অন্যান্য সামাজিক নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে মিথ্যা প্রচারের একটি বাহিনী তৈরি করেছে।

এত কিছুর মুখোমুখি হয়েও কিউবা বিগত ষাট বছর ধরে সমাজতন্ত্রের লড়াই জারি রেখেছে এবং 'হয় সমাজতন্ত্র নয় মৃত্যু' এমন প্রত্যয়ে কিউবার জনগণ ও নেতৃত্ব এগিয়ে চলেছে। এটা কীভাবে সম্ভব হয়েছে? সম্ভব হয়েছে মিথ্যা প্রচার, সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্র ইত্যাদির সাথে উত্তরাধুনিক ও নিওলিবারেল আক্রমণের মুখেও পার্টির নেতৃত্ব দেশের অতীত ইতিহাস দেশবাসীকে বিস্মৃত হতে দেননি। বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ও মূল উদ্দেশ্য নেতৃত্ব ভুলে যাননি, শত বাঁধাবিপত্তি-প্ররোচনার মধ্যেও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্জনগুলোকে এগিয়ে নেয়ার দৃঢ়তা দেখাতে পিছপা হননি। কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার নেতৃত্বাধীন জনগণের যৌথ উদ্যোগে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতিকে সুসংহত করা সম্ভব করেছে। শিক্ষা, জনগণের জন্য স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, মানুষের মর্যাদার সামাজিক স্বীকৃতি এবং দেশের মূল্যবান সম্পদ সুরক্ষার মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের অগ্রগতি আজকের দিনেও বিশ্বের জনগণের মনে আশার প্রদীপের মতো কিউবা বিরাজ করছে।

কিউবার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এবং সরাসরি আগ্রাসনের নতুন নতুন পরিকল্পনা সামনে আসছে। কিউবাও এক দশক হলো তাদের অর্থনীতিতে কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। একে কেন্দ্র করেই একদিকে মার্কিনীদের মিথ্যা প্রচার তুঙ্গে উঠেছে, আবার সেই মিথ্যা প্রচারকে হাতিয়ার করেই একের পর এক অর্থনৈতিক

বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। কিউবার পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করার সমস্ত রকম অপচেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ের মার্কিন আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে কিউবার বিদেশ মন্ত্রী Bruno Rodriguez ১১ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে বলেছেন —

> এই অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টার ফলাফল অবশ্যই রয়েছে। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে দেখা গেছে এইভাবে দ্বন্দ্ব, এমনকি যুদ্ধের প্ররোচনা তৈরি করতে, তারপর সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নেমে এসেছে সামরিক হস্তক্ষেপ এবং মার্কিন দখলদারিত্ব। ট্রাম্পের দ্বারা আরোপিত ২৪৩টি নতুন নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে অবরোধ আরোপ করাকে ন্যায্যতা দেওয়ার অজুহাত হিসাবে খাঁড়া করতে মার্কিন সরকারের অনুসরণ করা চিত্রনাট্যে কিউবাকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসাবে চিত্রিত করার জন্য মরিয়া প্রয়াস ছিল অসফলতার ও মূর্খতার প্রকাশ। পরবর্তী সময়ের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বাইডেন তার পূর্ণ শক্তি দিয়ে অর্থনৈতিক অবরোধের সেই ধারাকেই বজায় রাখতে চেষ্টা করছেন।

মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক, এশিয়ার আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ এবং তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে ফেলার মর্মান্তিক ঘটনার কথা আমাদের জানা।

কিউবার সংস্কার সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করে মার্কিন সরকার বিশ্ববাসীকে বুঝাতে চাইছে যে, কিউবা শেষ পর্যন্ত তাদের সমাজতান্ত্রিক কার্যক্রমকে বিদায় জানিয়েছে। গত বছর, ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে। কংগ্রেসে ১৬ এপ্রিল রাউল কাস্ত্রোর পেশ করা পার্টির কেন্দ্রীয় প্রতিবেদন পার্টির মুখপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কংগ্রেসের এই প্রতিবেদন হলো সংস্কার সম্পর্কে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাখ্যা এবং মার্কিন মিথ্যা প্রচারের সমুচিত জবাব। কেন্দ্রীয় প্রতিবেদন থেকে পরিষ্কার যে, কোন অবস্থাতেই কিউবা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ককে বিসর্জন দিতে রাজি নয় এবং তার জন্য কিউবার জনসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেখানে বলা হয়েছে —

> এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের (অর্থাৎ সংস্কারের) বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার আগে, কিছু কিছু পেশার ক্ষেত্রে ব্যক্তি উপার্জনের (private practice) দাবি করা হয়েছিল যখন অন্যদের সেই অনুমতি দেওয়া হয়নি। বুঝা যাচ্ছে যে আত্মস্বার্থ, লোভ এবং উচ্চ আয়ের আগ্রহ, কারো কারো মধ্যে এমন একটি বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া চালু করার আকাঙ্ক্ষা জন্ম দিয়েছে

যা ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে গড়ে ওঠা সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি ও সারমর্মকে ধ্বংস করে দেবে। এই পথটি গ্রহণ করলে জাতীয় শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা যা সমস্ত কিউবানদের জন্য বিনামূল্যে এবং সর্বজনীনভাবে অবারিত তা অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে। অন্যরা, বিদেশি বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের সমাজতান্ত্রিক নীতিকে দূর করার আশায়, বৈদেশিক বাণিজ্যের অ-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমদানির ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক অনুমোদনের দাবি করেছে।

এগুলি এমন প্রশ্ন যা কর্মীদের নেতৃত্বকারী অংশ এবং পার্টি সদস্যদের পক্ষে, অসচেতন সরলতা তো বটেই, এমনকি বিভ্রান্তির বিষয় হতে পারে না। এমন কিছু সীমা আছে যা আমরা অতিক্রম করতে পারি না কারণ ফলাফলগুলি অপরিবর্তনীয় হবে এবং কৌশলগত ত্রুটির দিকে নিয়ে যাবে, সমাজতন্ত্র এবং তার সাথে আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা ধ্বংস হবে।

আমি যখন এই বিষয়গুলির কথা বলি, তখন কিউবার বিপ্লবের কমান্ড্যান্টে এন জেফের কথাগুলি মনে আসে, যা তিনি ৪ এপ্রিল, ১৯৯২ সালে ইয়াং কমিউনিস্ট লিগের ষষ্ঠ কংগ্রেসের সমাপ্তি ভাষণে বলেছিলেন : 'সংকল্প ছাড়াই, সিদ্ধান্ত ছাড়াই, অবিচলিত তেজ ছাড়াই, বিপ্লব কখনও বিজয়ী হতো না, কারণ যাঁরা ছাড় দেয়, যাঁরা হাল ছেড়ে দেয়, যাঁরা নরম হয়ে পড়ে, যাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁরা কোথাও কিছু পায় না।'

এটা কখনই ভুলে যাওয়া যায় না যে, উৎপাদনের মৌলিক উপায়ের (fundamental means of production) উপর সমগ্র জনগণের মালিকানাই শ্রমিকদের প্রকৃত ক্ষমতার ভিত্তি।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ব্যবস্থাকে অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে কর্তৃত্বকারী প্রভাবশালী ফর্ম হিসাবে তার অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করতে এবং সংহত করতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। এটা এমন নয় যা ডিক্রি দ্বারা অর্জন করা যায়; সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্থায়িত্বের জন্য এটি একটি অপরিহার্য শর্ত। এইজন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ব্যবস্থাকে উসকে দেওয়ার জন্য কাঠামোতে ঝাঁকুনি দেওয়া অপরিহার্য — উপর থেকে নিচে এবং নিচ থেকে উপরে। জড়তা, চিরাচরিত প্রথা মেনে কাজ করার মনোভাব, উদ্যোগের অভাব এবং উপর থেকে নির্দেশের জন্য আরামদায়কভাবে অপেক্ষা করার বদভ্যাস নিশ্চিতভাবে ছেঁটে

ফেলতে হবে। পুরানো খারাপ অভ্যাস অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে এবং আমাদের কোম্পানি এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় উদ্যোক্তাসুলভ উদ্যম, সক্রিয় অনুশীলন গড়ে তুলতে হবে, যা ক্রমাগত বেশি বেশি করে স্বাধীনতার সাথে কাজ করবে, অধিকতর দক্ষতার সাথে উৎপাদনকে উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালাতে পারবে।

এই সব বলা সহজ, কিন্তু যা কঠিন তবে অসম্ভব কিছু নয়, তা হলো পরিবর্তনকে বাস্তবায়ন ও সুসংহত করা। অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদনে, আমদানির ক্ষতিকর অভ্যাস দূর করতে এবং আরও বহুমুখী ও প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানির অগ্রগতির জন্য মানসিকতায় একটি বাস্তব পরিবর্তনের প্রয়োজন।

আমরা অনুভব করি এত প্রতিকূলতার মুখেও কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণ সংগ্রামে এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় অবিচল থাকতে সক্ষম হবে। আমাদের দলের পক্ষ থেকে তাদের এই প্রয়াসের প্রতি সংগ্রামী সহমর্মিতা জ্ঞাপন করি ও সীমিত সাধ্যে যতটুকু সহযোগিতা সম্ভব সেই কাজে আমরা অবিচল থাকব। এমতাবস্থায় যেটুকু শক্তি নিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকে আছে তা বিশ্বপরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যথোপযুক্ত নয় তা বলাই বাহুল্য। তবে প্রতিনিয়ত কিউবার উপর আক্রমণ, মিথ্যা প্রচার করে সমাজতন্ত্রের ভাবমূর্তিকে বিকৃত করার প্রচেষ্টা এবং একটার পর একটা অর্থনৈতিক অবরোধের ফরমান জারি করে দেশটিকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা থেকে বুঝা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদ তাদের অস্তিত্বের পক্ষে সমাজতন্ত্রের শক্তিকে আজও কতটা বিপজ্জনক মনে করে।

উত্তর কোরিয়া

কিউবার সাথে যে দেশটি মার্কিনসহ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সামরিক আক্রমণ, অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ, বিরামহীন মিথ্যাপ্রচারের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রামে অবিচল আছে তা হলো উত্তর কোরিয়া—'Democratic Peoples Republic of Korea' বা 'ডিপিআরকে'। দীর্ঘদিন যাবত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী প্রচারযন্ত্র উত্তর কোরিয়া সম্পর্কে মানুষের মনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য নানাভাবে মিথ্যা প্রচার করে আসছে এবং সোভিয়েত ও পূর্ব-ইউরোপের সমাজতন্ত্র পতনের পর এই আক্রমণ আরও তীব্র হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা উত্তর কোরিয়াকে চারিদিক থেকে চাপ দিয়ে তাদের সমাজতান্ত্রিক পথ থেকে বিচ্যুত করতে চাইলেও উত্তর কোরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি এবং জনগণ দেশকে সমাজতান্ত্রিক পথে এগিয়ে নিতে দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করে চলেছে।

১৫ আগস্ট ১৯৪৫-এ কোরিয়া জাপানি সামরিক দখল থেকে মুক্ত হওয়ার পর, কিম ইল সুং-এর নেতৃত্বে এর উত্তর অংশে একটি নতুন সমাজ নির্মাণের সংকল্পে উত্তর কোরিয়ার অস্থায়ী পিপলস কমিটি প্রতিষ্ঠা (Provisional People's Committee of North Korea) হয়। এরপরই প্রতিটি প্রদেশ, শহর এবং কাউন্টিতে পিপলস কমিটির সদস্যদের নির্বাচন সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়, যা কোরিয়ার ইতিহাসে ছিল এক অভূতপূর্ব ও চমকপ্রদ ঘটনা। নির্বাচনে বিজয়ের ভিত্তিতে, কোরিয়ার পিপলস অ্যাসেম্বলি ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তারপরে কোরিয়ার স্থায়ী পিপলস কমিটির সূচনা ঘটে। এই পিপলস কমিটির নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কৃষি সংস্কার কর্মসূচি নেওয়া হয় এবং প্রধান প্রধান শিল্প জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৪৮ সালে গ্রহণ করা হয় গণতান্ত্রিক পিপলস রিপাবলিক অব কোরিয়ার প্রথম সংবিধান, পরে এই প্রথম সংবিধানকে ১৯৭২ সালে সংশোধন করে নতুন করে সংবিধান গ্রহণ করা হয়।

পশ্চিমী গণমাধ্যম উত্তর কোরিয়ার শাসনব্যবস্থাকে ডিকটেটরশিপ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ভাঁড় হিসাবে প্রতিপন্ন করতে অবিরত প্রচার চালাচ্ছে, কারণ তাঁরা সামান্যতম সমাজতান্ত্রিক শক্তিকেও তাদের স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করে। ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে, উত্তর কোরিয়া গুরুতর অর্থনৈতিক সংকট অনুভব করতে শুরু করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়েছিল, এবং কোরিয়ার পূর্ব ইউরোপীয় মিত্র দেশগুলোতে কমিউনিস্ট শাসনের পতন ঘটেছিল। সেই দেশগুলো ছিল উত্তর কোরিয়ার বেশিরভাগ বাণিজ্যের অংশীদার এবং তাদের থেকে সাহায্য সহযোগিতা পেতো। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই সব সাহায্যের সম্ভাবনা থাকল না। চীনও এই সময় উত্তর কোরিয়াকে উপকরণ সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ না করলেও কমিয়ে দেয় এবং ১৯৯২ সাল থেকে গ্রান্টস-ইন-এইড বা ক্রেডিট অ্যাকাউন্টের পরিবর্তে নগদ অর্থ প্রদানের দাবি করতে শুরু করে। এছাড়াও, ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে দেশটি বন্যা ও খরাসহ একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়েছিল। মারাত্মক শস্য ও খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয় এবং সারা দেশে অনাহার ও অপুষ্টি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। চারিদিকে তখন সাম্রাজ্যবাদীদের উল্লাস, বিশ্বজুড়ে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের মধ্যে নেমে এসেছিল হতাশা, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ হয়েছে তীব্র। এ এমনই একটা হতাশাজনক পরিস্থিতি যখন যা কিছু শুভ, যা কিছু প্রগতিশীল, যা কিছু মানুষের মুক্তি পথের অর্জন সব কিছুর উপর মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলছে। ঠিক সেই সময়, ১৯৯২ সালের

নভেম্বর মাসে উত্তর কোরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করে —

> বর্তমানে পার্টি ও নেতৃত্বের নির্দেশনায় সমাজতন্ত্রের অবিচলিত পথে আমাদের দেশের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রযাত্রাকে সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলরা স্তব্ধ করার জন্য তাদের পক্ষে যা যা করা সম্ভব বলে ভাবা যেতে পারে সবই করছে। শত্রুরা তাদের পদক্ষেপে যত বেশি মরিয়া হয়ে উঠবে, ততই আমাদের সমাজতন্ত্রের পতাকাকে ঊর্ধ্বে ধরে রাখতে হবে, যাতে আমরা বিপ্লবী আক্রমণের আঘাতে তাদের প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তকে প্রত্যাঘাত করতে পারি।
>
> এই গ্রহে সমাজতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তাদের উন্মত্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, সমাজতন্ত্র বিশ্বের বিপ্লবী-মনস্ক মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে এবং সেই পথেই বিপ্লবী মানুষ অগ্রসর হবে। সমাজতন্ত্র মানবজাতির আদর্শ এবং ইতিহাসের বিকাশের নিয়মেই এর চূড়ান্ত বিজয় হবে। সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলরা যতই চেষ্টা করুক সমাজতন্ত্রকে স্তব্ধ করে দিতে, তারা কখনোই ইতিহাসের জোয়ারকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারবে না। আজ বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী জনগণ পিয়ংইয়ং ঘোষণার ব্যানারে সমাজতন্ত্রের স্বার্থ রক্ষা ও অগ্রসর হওয়ার জন্য একটি সাহসী সংগ্রাম চালাচ্ছে। সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতি পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শক্তিশালী প্রভাব ফেলছে, এমনকি সেই সমস্ত দেশগুলিতে যেখানে এই পরীক্ষা সাময়িকভাবে ভেঙে পড়েছে। এতে কোনো সন্দেহের ছায়া নেই যে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী দল ও জনগণের সংগ্রামের কারণে সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের কূটচাল হতাশায় নিক্ষেপ করে সমাজতন্ত্র অগ্রসর হতে থাকবে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবে।

উক্ত পিয়ং ইয়ং ঘোষণাতে আমাদের দলও অন্যতম স্বাক্ষরকারী।

এই সমাজতান্ত্রিক কোরিয়ার সাথে তাই সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের যে অনিবার্যতা তা সোভিয়েত-উত্তর পর্বেও অব্যাহত থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

কোরিয়ায় সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ অঙ্গ এবং প্রাথমিক আইন প্রনয়ণকারী সংস্থা হলো সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেমব্লি (SPA)। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাঁচ বছরের মেয়াদে নির্বাচিত একটি এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা যেখানে ৬৮৭ জন সদস্য নির্বাচিত হন। সংবিধান অনুযায়ী এই সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেমব্লি একটি ১৫ সদস্যের প্রেসিডিয়াম বা স্থায়ী কমিটিকে নির্বাচিত করে। সুপ্রিম অ্যাসেমব্লির বছরে দুইবার অধিবেশন বসে, মধ্যবর্তী

সময়ে প্রেসিডিয়াম আইনসভার প্রতিদিনের বেশিরভাগ কাজ পরিচালনা করে। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, প্রেসিডিয়াম হল SPA-এর অধিবেশনগুলির মধ্যে বিরতির সময় ক্ষমতার সর্বোচ্চ অঙ্গ, যদিও প্রেসিডিয়াম SPA-এর কাছে দায়বদ্ধ থাকে। সরকারের প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রী, তাকে সহায়তা করার জন্য কয়েকজন উপপ্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেম্বলি (এসপিএ) দ্বারা নিযুক্ত হন। SPA-এর প্রেসিডেন্ট হলেন উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান। রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হলো শ্রমিক-কৃষক শ্রেণির পার্টি — কোরিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টি (KWP), যার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব পার্টি কংগ্রেসের উপর ন্যস্ত। দুই কংগ্রেসের মধ্যবর্তীকালে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে পার্টি পরিচালিত হয়। ১৯৬৬ সাল থেকে উত্তর কোরিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি — 'ওয়ার্কার্স পার্টি অব কোরিয়া' — স্বাধীন লাইন নিয়ে চলবার কথা বলে আসছে। সেই সময় তাদের দলের নীতি হিসাবে ঘোষণা করা হয় —

> সম্পূর্ণ সমতা, সার্বভৌমত্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং দেশে দেশে কমিউনিস্ট এবং শ্রমিকশ্রেণির দলের মধ্যে হস্তক্ষেপ না করা। (complete equality, sovereignty, mutual respect, and noninterference among the communist and workers' parties.)

এই পার্টি লাইন থেকে, ওয়ার্কার্স পার্টি অব কোরিয়ার তাত্ত্বিকরা চারটি স্ব-নির্ভরতা ('juche'-জুচে) নীতি তৈরি করেছেন —

> মতাদর্শে স্বায়ত্তশাসন, রাজনীতিতে স্বাধীনতা, অর্থনীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং প্রতিরক্ষায় স্বনির্ভরতা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ২০০২ সালের জানুয়ারিতে ইরান ও ইরাকের সাথে উত্তর কোরিয়াকেও ঘোষণা করে 'axis of evil' — অর্থাৎ শয়তান রাষ্ট্র। উত্তর কোরিয়ার অস্তিত্ব যে কতখানি হুমকির মুখে ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই কথা থেকে তা সহজেই অনুমেয়। এই কারণে, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যেই উত্তর কোরিয়া ২০০২ সাল থেকেই তাদের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা বানানোর পরিকল্পনা করে এবং ২০১৬ সালের মধ্যে সেই সক্ষমতা অর্জন করে। ৮০০০ কিলোমিটার দূরে আঘাত করতে সক্ষম ইন্টার-কন্টিনেন্টাল ব্যালেস্টিক মিসাইলও উত্তর কোরিয়া বানিয়েছে যা সরাসরি মার্কিন ভূখণ্ডে আঘাত করতে সক্ষম। জনগণের সাথে দল, দলের নেতৃত্ব এবং আইনসভার দৃঢ়বদ্ধ সম্পর্ক এবং সমাজতান্ত্রিক

আদর্শই উত্তর কোরিয়ার শক্তি যার বলে বলীয়ান হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত হামলা তাঁরা মোকাবিলা করে চলেছে। তাঁদের অনেক নতুন ব্যাখ্যা সম্বলিত আদর্শগত ধারণা ও রাজনৈতিক নানা বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আমাদের জানার অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তা সত্ত্বেও কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টি এবং এর জনগণ দুই কোরিয়ার পুনঃএকত্রীকরণের সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই এবং সমাজতন্ত্রের এই অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখবে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে গণবিক্ষোভ ও আন্দোলন

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে মাঝেই মাঝেই জনগণের বিক্ষোভ যেভাবে আন্দোলনের রূপে প্রকাশ পাচ্ছে তা লক্ষণীয়। দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন ফেটে পড়ছে। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে WTO-এর কাউন্সিল অব মিনিস্টারদের সম্মেলনকে বিরোধিতা করে সিয়াটলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানুষের যে আন্দোলন, যাকে বুর্জোয়া প্রেসই আখ্যা দিয়েছিল 'Battle of Seattle' বলে, তা থেকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছিল। এমন অনেক বিক্ষোভই আমেরিকার সিয়াটল থেকে ইতালির জেনোয়া পর্যন্ত ক্রমেই বেড়ে চলেছে যা সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাপিয়ে দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে ৯৯ ভাগ বনাম ১ ভাগ আন্দোলন, বিশ্বের সেরা ধনী মার্কিনীদের ধনবৈষম্যের আসল চেহারা উন্মোচিত করেছে। 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' খ্যাত বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনও দুনিয়াজুড়ে সাড়া জাগিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের দখলদারী ভূমিকায় বিধ্বস্ত আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, সিরিয়াসহ অন্যান্য দেশের জনগণের লড়াই; স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম; সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংকল্পে ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়াসহ ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহের লড়াই; নেপালে কমিউনিস্টদের রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্বে রাখার সংগ্রাম; আফ্রিকার সেনেগাল, বুরকিনাফাসো, সুদান ও কঙ্গোর জনগণের নয়া-ঔপনবেশিকতার বিরুদ্ধে লড়াই; পশ্চিম আফ্রিকার মালিতে ফরাসি ও বেলজিয়ান সৈন্য অপসারণের লড়াই; মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে উত্তর কোরিয়া, কিউবার জনগণের সমাজতন্ত্র রক্ষার লড়াই ইত্যাদি মিলে সাম্রাজ্যবাদের সাথে এই সব শক্তিসমূহের দ্বন্দ্বও গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছে। লাতিন আমেরিকার জনগণ কিউবার অসমসাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধে অনুপ্রাণিত হয়ে ফিদেল কাস্ত্রো ও চে-গুয়েভেরাকে সামনে রেখে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একাট্টা হচ্ছে। ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়ার শাসক দলসমূহ প্রকাশ্যে সমাজতন্ত্রের ঘোষণা দিয়ে কীভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে

দাঁড়িয়েছিল তা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে কমরেড স্ট্যালিন ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করতে ও বিশ্বশান্তির পক্ষে যেভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শক্তির অনুপস্থিতিতে আজ আর বিশ্বের নিপীড়িত জনগণ তাদের সংগ্রামে এই দ্বন্দ্বকে সেইভাবে কাজে লাগাতে পারছে না। লক্ষণীয় যে কখনো কখনো যুদ্ধের প্রশ্নে যুদ্ধবাজ মার্কিন সমরচক্রের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় দেশগুলির কেউ কেউ বিরোধিতা করে, এই নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য তৈরি হয়। কিন্তু, জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের তীব্রতার অভাবে তারা শেষ পর্যন্ত মার্কিন সামরিক হামলার পক্ষেই সায় দিচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, গুটিকয়েক সাম্রাজ্যবাদী দেশের সাথে বিশ্বের নিপীড়িত শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ জনগণের যে দ্বন্দ্বকে তৃতীয় মূল দ্বন্দ্ব হিসাবে স্ট্যালিন ব্যাখ্যা করেছিলেন, যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি তা হীনবল হয়ে পড়লেও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েনি।

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি শ্রমিকশ্রেণির দলের সামনে যে গুরুদায়িত্ব এনে দিয়েছে তা হলো, একদিকে নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে যেখানেই জনগণের আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে তার সাথে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করা এবং সেই প্রক্রিয়ায় বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার ঐক্যের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। অন্যদিকে সংশোধনবাদ ও প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহত্বকে জনমনে প্রতিষ্ঠা করে পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্য পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার বর্তমান স্বরূপ সঠিকভাবে অনুধাবন, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন ও দেশে দেশে বিপ্লবী সংগ্রামের সফলতা ও ব্যর্থতার বিশদ পর্যালোচনা ও তার থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে আজকের সমৃদ্ধ শিক্ষায় বিপ্লবী সংগ্রামকে পুনর্গঠিত করা জরুরি।

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগের সংকট

বিশ্বপুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বর্তমানে তার ইতিহাসের তীব্রতম সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে। বহু বিশেষজ্ঞের মতে ২০০৮ সালের বিপর্যয়ের পর মন্দা যত দীর্ঘকাল জুড়ে চলছে তা স্থায়িত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী মহামন্দার প্রভাবকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। অ্যান পেটিফোর, একজন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ, সম্প্রতি *নেচার* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে বৈশ্বিক মুদ্রা ও আর্থিক ব্যবস্থাকে বলেছেন — জরাজীর্ণ, নড়বড়ে একটা ব্যবস্থা 'ramshackle global financial system' এবং তিনি মনে করেন সেটা অনেক আগে থেকেই এই রকম। (Nature 582,

461, 2020)। তিনি বলেছেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সমঝোতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ব্রেটন উডস আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থাকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ১৯৭১ সালে একতরফাভাবে ভেঙে দিয়েছেন এবং এখন বৈশ্বিক মুদ্রা ও আর্থিক ব্যবস্থা অনেকাংশই নিয়ন্ত্রণহীন বেসরকারি সংস্থার হাতে। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই কারণ রয়েছে যা কিনা সংকটকে বারে বারে ডেকে আনছে (Riddled with comorbidities, the current global monetary and financial set-up precipitates crises with increasing frequency)। তাঁর মতে বর্তমান বৈশ্বিক মুদ্রা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সহজাত সমস্যায় আচ্ছন্ন এবং সেই কারণই ক্রমবর্ধমান হারে সংকটকে বারে বারে ডেকে আনছে। প্রথমে, এইসব সংকট বিশ্ব অর্থনীতির প্রান্তে থাকলেও ২০০৭-০৯ সাল থেকে সংকট চলে এসেছে বৈশ্বিক অর্থনীতির কেন্দ্রে।

তাহলে, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা এবং পুঁজিবাদী বিশ্বের মাতব্বরেরা নিজেরাই স্বীকার করছেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা ১৯৭১ সালের পর যেভাবে গঠিত হয়েছে তাতে সমস্ত দেশের জাতীয় অর্থনীতি এবং বিশ্ব-বাণিজ্য ব্যবস্থাকে জরাজীর্ণ, নড়বড়ে হিসাবেই বর্ণনা করা যেতে পারে। তাঁরাই বেসরকারিকরণের মধ্যে বিপদের আঁচ পাচ্ছেন, কারণ যা যা আজ বিশ্ব অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে — যার অধিকাংশই বেসরকারি — সেইগুলো বেশিরভাগই নিয়ন্ত্রণহীন। কোন-রকমে কাজচালানো গোছের একগুচ্ছ আইনি ব্যবস্থা দিয়ে সংকট মোকাবিলার চেষ্টা চলছে। কিন্তু আমরা জানি এই সংকটের উৎস ১৯৭১ সালের পরে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কারণে নয়। মার্কসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী পুঁজিবাদের এই সংকট তার অন্তর্নিহিত ভারসাম্যহীনতার মধ্যেই নিহিত ছিল, এখনো আছে এবং যতদিন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ থাকবে ততদিনই এই সংকট বারে বারে ফিরে আসবে।

বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ভাঙনের পর, দেশে দেশে শোষণমুক্তির সংগ্রাম আদর্শগত ও সাংগঠনিক উভয়দিক থেকেই গুরুতরভাবে দুর্বল হয়েছে। তাই বাস্তব সংকট যত মারাত্মকই হোক না কেন শ্রমিকশ্রেণি তার পূর্ণ সুযোগ নিতে পারছে না। সেই সুযোগে বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদ একতরফা আধিপত্য চালাচ্ছে, যা দেখে সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশ এমনকি মার্কসবাদীদের একটি অংশও বিভ্রান্ত। তাঁদের অনেকেই বলছেন, মার্কস পুঁজিবাদের অনিবার্য ধ্বংসের যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তা তো ঘটেনি বরং দেখা যাচ্ছে মুমূর্ষু পুঁজিবাদের আয়ু ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। এই ঘটনা দেখে অনেকেই ভাবছেন, পুঁজিবাদের

একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, যা দিয়ে সে বার বার সংকট কাটিয়ে উঠছে। এভাবেই যাঁরা ভাবছেন তাঁরা মার্কসবাদের মূল যুক্তিপদ্ধতি বুঝতে পারেননি। তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে কমরেড লেনিন বলেছেন —

> একেবারে আশাহীন পরিস্থিতি বলে কিছু নেই। বুর্জোয়ারা মাথা খারাপ হয়ে যাওয়া নির্লজ্জ লুণ্ঠনকারীর মতো আচরণ করছে; তারা মূর্খতার পর মূর্খতা করছে, এইভাবে পরিস্থিতিকে আরও হতাশজনক করে তুলছে এবং তাদের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করছে। এ সবই সত্য. কিন্তু কেউই 'প্রমাণ' করতে পারবে না যে, তাদের পক্ষে শোষিত শ্রেণির একটি ক্ষুদ্র অংশকে সামান্য ছাড় দিয়ে শান্ত রাখা এবং নিপীড়িত ও শোষিতদের কিছু অংশের আন্দোলন বা বিদ্রোহ দমন করা একেবারেই অসম্ভব। (লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলি-৩১, পৃষ্ঠা-২২৭)। [There is no such thing as an absolutely hopeless situation. The bourgeoisie are behaving like barefaced plunderer who have lost their heads; they are committing folly after folly, thus aggravating the situation and hastening their doom. All that is true. But nobody can 'prove' that it is absolutely impossible for them to pacify a minority of the exploited with some petty concessions and suppress some movement or uprising of some section of the oppressed and exploited (Lenin CW vil 31 page 227)].

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে তীব্র সংকট থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষা করার জন্য জন মেনার্ড কেইনস সরকারি তহবিল কাজে লাগিয়ে বাজারে চাহিদা সৃষ্টির যে দাওয়াই দেন তা মেনে পুঁজিবাদী সরকারগুলি একদিকে সরকারি উদ্যোগে শিল্পক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করে কৃষি ক্ষেত্রে ভর্তুকি দেয় ও নানা সামাজিক সুরক্ষা ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ায়, অন্যদিকে সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে। এইভাবে সরকারি উদ্যোগে কৃত্রিমভাবে বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করে তারা সাময়িকভাবে সংকটকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উপস্থিতিকে অজুহাত করে সাম্রাজ্যবাদ ঠান্ডাযুদ্ধের রাজনীতি শুরু করে এবং তারই আড়ালে অর্থনীতিকে সচল রাখতে সামরিক অস্ত্র-সস্ত্রের ক্রমাগত উৎপাদন বাড়িয়ে চলে। এই উৎপাদনের সুবিধা হলো এই যে অস্ত্র-সস্ত্র জনগণের পয়সায় সরকারই কেনে, অস্ত্র-সস্ত্রকে বিক্রির জন্য বাজার খুঁজতে হয় না। সামরিক অস্ত্র-সস্ত্রের কারখানা অর্থনীতিতে শুধুমাত্র পরোক্ষ বা

প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে না, তার বাইরে induced effect-এর কারণেও সাময়িকভাবে হলেও কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-সস্ত্র উৎপাদন করে তা নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারে না, তা ব্যবহারের পরিস্থিতি তৈরি করতে হয়। এই কারণে, বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে না পারলেও বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় সর্বদা ছোটখাট যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করতে হয়। নানা রাষ্ট্রকে যুদ্ধপরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিয়ে তাদেরকে দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র কিনতে বাধ্য করতে হয়। সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘকালব্যপী ইরাক-ইরান যুদ্ধ, আফগানিস্তানের যুদ্ধ, সিরিয়ার যুদ্ধ, আফ্রিকার বিভিন্ন গরিব দেশগুলো মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে দীর্ঘ দশ বছর ধরে ইরাক-ইরান যুদ্ধ চলেছিল তাতে মার্কিন সরকার ও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী জোট ইরাককে সমর্থনের নামে যুদ্ধ সরঞ্জাম কেনার জন্য ঋণ দিয়েছে এবং সেই ঋণের টাকায় ইরাক তাদের থেকেই যুদ্ধ সরঞ্জাম কিনেছে। সরকারিভাবে ইরানের উপর আরোপ করা হয়েছিল বিধিনিষেধ (sanctions), কিন্তু যুদ্ধ শেষে জানা গেল আমেরিকা গোপনে একইসাথে ইরানকেও মিসাইল বিক্রি করেছে। শুধু তাই নয়, এই মিসাইল বিক্রির মুনাফা আমেরিকা দিয়েছে নিকারাগুয়ার প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে যারা সেখানে কিউবার সহযোগী প্রগতিশীল সরকারের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কাজে লিপ্ত ছিল।

শ্রমজীবী শ্রেণিকে যুদ্ধের উদ্দেশ্য এবং তার মূল উৎস সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বুঝার প্রয়োজন, তা না হলেই শ্রমিকশ্রেণি নৈরাজ্যবাদী প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত হবে এবং ভিন্ন পথে চালিত হবে। আমরা যদি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সকল শক্তিকে নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা সময়ের ডাক বলে মনে করি এবং সেই প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে যুক্ত করতে চাই তবে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পরিষ্কার থাকতে হবে। লেনিন বলেছিলেন —

> সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা বলতে, শব্দটির বিস্তৃত অর্থে, আমরা সাম্রাজ্যবাদের সাধারণ আদর্শের সাথে সম্পর্কিত সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রতি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝিয়ে থাকি। (By the critique of imperialism, in the broad sense of the term, we mean the attitude of the different classes of society towards imperialist policy in connection with their general ideology.)

এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদের কৌশল এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের অর্থনৈতিক ও শ্রেণি স্বার্থের সুনির্দিষ্ট মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে হতে হবে। শুধুমাত্র তার ভিত্তিতেই শ্রমিক শ্রেণি তার স্বাধীন কর্মসূচি গড়ে তুলতে পারে এবং প্রতিটি দেশের শাসকগোষ্ঠী জঙ্গি জাতীয়তাবাদী আবেগ তৈরি করে যুদ্ধের ন্যায্যতার সপক্ষে যে প্রচার চালায় তার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণি অপ্রতিরোধ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

সামরিকবাদ (militarism) এবং যুদ্ধের অপরিহার্য কারণ বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গভীরে উপস্থিত দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে নিহিত আছে। তাই, লেনিনের মতে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্লেষণ এবং এর দ্বন্দ্বের গভীরতার উন্মোচনের কাজ এড়িয়ে যেতে চাইলে, তার পরিবর্তে যাই করি না কেন, তা হবে সংস্কারবাদী প্রবণতা। (Instead of an analysis of imperialism and an exposure of the depths of its contradictions, we have nothing but a reformist "pious wish" to wave them aside, to evade them.- Lenin, 'Imperialism is the Highest Stage of Capitalism') বর্তমান সময়ের সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বগুলি যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাবে যে: ১) একদিকে বাণিজ্যের অবাধ প্রসারের ও পুঁজি বিনিয়োগের সম্প্রসারিত ক্ষেত্র প্রস্তুত করার লক্ষ্যে বিশ্বায়নের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী একীভূত (integrated) এবং পরস্পর নির্ভরশীল অর্থনীতি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছে এবং, অন্যদিকে, বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা ও রাজনৈতিক ও ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের মধ্যে নিজস্ব স্বার্থের বিভাজন রয়েছে। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ডেকে আনে। ২) একদিকে বৈশ্বিক উৎপাদনের চরিত্র হলো সামাজিক, কিন্তু উৎপাদনের হাতিয়ারের উপর রয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানা। সেই কারণে সামাজিক উৎপাদনকে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির ব্যক্তিপুঁজির মুনাফা সঞ্চয়ের অধীনস্ত করে ফেলার যে ব্যবস্থা তার মধ্যেই দ্বন্দ্ব রয়েছে। কাঁচামাল, তেল, গ্যাস পাইপলাইন, বাণিজ্য রুট ও সস্তা শ্রমের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য এবং বাজারগুলিতে একচ্ছত্র প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যাংক এবং কর্পোরেশনগুলোর শক্তিশালী কার্টেলগুলো বাণিজ্যিক লড়াই এড়াতে পারে না এবং শেষ পর্যন্ত সামরিক লড়াই চালাতে 'তাদের' রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির কারণে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বজুড়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সহজ হবে ভেবেছিল। প্রবল উৎসাহে

তারা 'ইতিহাসের সমাপ্তি' ঘোষণা করে দিয়ে এক মেরু বিশ্বের 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' তৈরির স্বপ্ন দেখেছিল। একদিকে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসাবে চীনের উত্থান, অন্যদিকে বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের নিজস্ব স্বার্থের লড়াই সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরের দ্বন্দ্বকে প্রকট করে তুলে মার্কিন একমেরু বিশ্বের আশাকে দিবাস্বপ্নে পর্যবসিত করেছে। চীন তার বাণিজ্য প্রসারের জন্য এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর সামরিক ও রাজনৈতিক উপস্থিতি শক্তিশালী করার জন্য বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) গ্রহণ করেছে, যাকে অনেকেই নিউ সিল্ক রোড বলে উল্লেখ করছেন। প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং ২০১৩ সালে এই প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন, যা অনেকগুলো উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ উদ্যোগের সম্মিলিত রূপ (the vast collection of development and investment initiatives)। সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্ব এশিয়া থেকে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত অবকাঠামো নির্মাণে এত বড় এবং উচ্চাভিলাষী প্রকল্প আজ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন চীনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবকে যে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করবে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দীর্ঘমেয়াদে এই প্রকল্প চীনের পণ্যের বাজার বিকাশের সহায়ক হবে এবং স্বল্পমেয়াদে শিল্পের অব্যবহৃত ক্ষমতাকে (idle capacity) কাজে লাগানোর বিকল্প হিসাবে সহায়তা করবে। বেল্ট অ্যান্ড রোড অবকাঠামো বিনিয়োগ ছয়টি অর্থনৈতিক করিডোরের মাধ্যমে বিশ্বের শক্তি এবং সম্পদ সমৃদ্ধ এক বৃহৎ অঞ্চলকে সংযুক্ত করবে। এই ছয়টি হলো —

১. নতুন ইউরেশিয়া ল্যান্ড ব্রিজ : কাজাকিস্তান, রাশিয়া, বেলারুশ এবং পোল্যান্ড হয়ে ইউরোপে রেলের সাথে জড়িত।

২. চীন, মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া অর্থনৈতিক করিডোর : পণ্য বাণিজ্যের জন্য রেল, রাস্তা, সেতুর সংযোগ স্থাপন।

৩. চীন, মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া অর্থনৈতিক করিডোর : কাজাকিস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, ইরান এবং তুরস্কের সাথে সংযোগ।

৪. চায়না ইন্দোচীন পেনিনসুলা ইকোনমিক করিডোর : ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, লাওস পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক, কম্বোডিয়া, মায়ানমার এবং মালয়েশিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন।

৫. চীন, পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর : এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি স্থলবেষ্টিত জিনজিয়াংয়ের কাশগর শহরকে (মুক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল)

পাকিস্তানের গদর (Gwadar) বন্দরের সাথে সংযুক্ত করেছে। বাণিজ্যিক ও সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এটি একটি গভীর সমুদ্র বন্দর।

৬. চীন, বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার অর্থনৈতিক করিডোর : ভারত ও চীনের মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে অবিশ্বাসের কারণে এটি আপাতত ধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে, যদিও বাংলাদেশ এর সাথে যুক্ত আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিন্ন অন্য কোন দেশের আঞ্চলিক বা বৈশ্বিক ক্ষমতার ভরকেন্দ্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনাযুক্ত যে কোন প্রয়াসই মার্কিন কৌশলের পরিপন্থি। এই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে কেন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের তা বুঝে নিতে হবে।

সোভিয়েতের পতনের পরেই, ১৯৯২ সালে পল উলফোভিটজ (Paul Wolfowitz), তৎকালীন মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি, যে 'প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা নির্দেশিকা' (Defense Planning Guidance) ঘোষণা করেন তাতে মার্কিনীদের সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ এবং চীনের সাথে দ্বন্দ্বের চরিত্রটি পরিষ্কার হয়ে যায়। নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল —

'আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হলো একটি নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর পুনঃউত্থান রোধ করা। এটি নতুন আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা কৌশলের অন্তর্নিহিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় এবং প্রয়োজন হলো আমাদের প্রতিরোধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া যাতে কোন বৈরী শক্তি এমন কোন অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে যাতে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সেই অঞ্চলের সম্পদ তাকে বৈশ্বিক শক্তি হিসাবে জন্ম দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে ওঠে। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে পশ্চিম ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া।' ('Our first objective is to prevent the re-emergence of a new rival. This is a dominant consideration underlying the new regional defense strategy and requires that we endeavor to prevent any hostile power from dominating a region whose resources would, under consolidated control, be sufficient to generate global power. These regions include Western Europe, East Asia, the territory of the former Soviet Union, and Southwest Asia.')

এর পরের অংশে বলা হয় :

এই উদ্দেশ্যের তিনটি অতিরিক্ত দিক রয়েছে : প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই একটি 'নিউ অর্ডার' প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দিতে হবে, যে 'নিউ অর্ডার'-এ সম্ভাব্য প্রতিযোগীদের নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মানোর জন্য এমন প্রতিশ্রুতি থাকবে যে তাদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সুরক্ষার জন্য কোন বৃহত্তর ভূমিকা পালন ও আক্রমণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণের অভিলাষ পোষণের কোন প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত, অ-প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রগুলিতে, আমাদের অবশ্যই শিল্পোন্নত দেশগুলির স্বার্থের কথা যথেষ্ট বিবেচনায় রাখতে হবে যাতে আমাদের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা বা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উল্টে দিতে তাদের নিরুৎসাহিত করা যায়। পরিশেষে, আমাদের অবশ্যই সম্ভাব্য প্রতিযোগীদের বৃহত্তর আঞ্চলিক বা বৈশ্বিক ভূমিকা পালনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা থেকেও নিবৃত্ত করার প্রক্রিয়া বজায় রাখতে হবে। ('There are three additional aspects to this objective: First the U.S must show the leadership necessary to establish and protect a new order that holds the promise of convincing potential competitors that they need not aspire to a greater role or pursue a more aggressive posture to protect their legitimate interests. Second, in the non-defense areas, we must account sufficiently for the interests of the advanced industrial nations to discourage them from challenging our leadership or seeking to overturn the established political and economic order. Finally, we must maintain the mechanisms for deterring potential competitors from even aspiring to a larger regional or global role.')

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান *'Belfer Center Studies in International Security'* ২০১৪ সালে একটি বই প্রকাশ করেছে — *The Next Great War? : The Roots of World War-I and the Risk of U.S.-China Conflict* (R. N. Rosecrance and S. E. Miller (ed.), The MIT Press, Cambridge)। তাদের বিশ্লেষণ থেকে পরিষ্কার যে চীনের অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তি হিসাবে উত্থান পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় কি পরিমাণ স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। সেখানে বলা হয়েছে —

চীন যদি আগামী দশকের মধ্যে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়, তাহলে তৃতীয় জর্জ ব্রিটিশ সিংহাসনে বসার পর এটিই প্রথমবারের মতো একটি অ-পশ্চিমা, অ-অ্যাংলো স্যাক্সন, অ-ইংরেজিভাষী, অ-গণতান্ত্রিক দেশ তেমনটা হবে। তাই যদি কেউ ধরে নেয় যে চীনের ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অভ্যুত্থান বর্তমান বৈশ্বিক নিয়মভিত্তিক ব্যবস্থার উপর কোন প্রভাব ছাড়াই ঘটে যাবে তবে সে ইতিহাসের একজন মূর্খ ছাত্র। এই প্রেক্ষাপটে, অতএব এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ইউরোপ এবং 'পশ্চিম' বলে যে ধারণা তা সাধারণভাবে এশিয়া, এবং বিশেষ করে চীনের, দীর্ঘ এবং বৃহৎ অংশের উপর ইতিমধ্যেই নেতিবাচক ছায়া ফেলে আছে। (If China, as is likely, becomes the world's largest economy within the next decade, it will be the first time since George III was on the British throne that a non-western, non-Anglo Saxon, non-English speaking, nondemocracy will have been so. Thus, anyone who assumes that China's growing global economic ascendancy will pass without any impact on the current global rules-based order is a poor student of history. In this context, therefore, it is important to remember that Europe and the idea of 'the West' has already cast a long and in large part negative shadow over Asia, in general, and China, in particular., p-201)

সেখানে এর পরে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে পরিষ্কার যে বাজার দখল, কাঁচামাল লুণ্ঠন এবং বাণিজ্য পথের উপর অধিকার রক্ষাকে কেন্দ্র করে আবার যুদ্ধবাজরা হয়ত সাধারণ মানুষের ঘাড়ে আরও একটা মহাযুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার জমি প্রস্তুত করছে। বলা হয়েছে —

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারকদের কারো কারো ধারণা এই যে চীন কেবল উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় আছে, একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কৌশলগত সম্পর্কের পারদকে ঘোষণামূলক স্তরে নামিয়ে এনেছে, অন্যদিকে নিজের রাষ্টীয় শক্তিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পটি কার্যকরভাবে চালিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতের সেই দিনের অপেক্ষায় যতদিন না চীন একতরফাভাবে নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ শুরু করার শক্তি অর্জন করতে পারে। [(Or worse,) the perception of some in the U.S. foreign policy establishment that China

is simply buying time, taking the strategic temperature down in the U.S. relationship at a declaratory level, while operationally continuing its long-term project of maximizing its national power, against that day in the future when China is able to begin to act unilaterally. P-202]

চীন যেখানে মার্কিন স্বার্থের এতবড় প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যা উপরে আলোচনা করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুস্পষ্ট কৌশলের পরিপন্থি, তখন বোঝাই যাচ্ছে যে, 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার'-এর মধ্যে 'নিউ' কিছু নেই। সবটাই পুরনো এবং সাম্রাজ্যবাদীদের যে চরিত্র লেনিন বর্ণনা করেছিলেন সম্পূর্ণ তার মতোই।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার'-এর স্বপ্নবিলাসের কাল তিরিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তিরিশ বছর ধরে তার ঘোষিত কৌশল অনুযায়ী আধিপত্য বিস্তারে ও কোন আঞ্চলিক শক্তিকে মাথা তুলতে না দিতে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইরাক, ইরান, সিরিয়া, আফগানিস্তান সর্বত্র যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কিন পুঁজিবাদ ক্রমশই হীনবল হয়ে পড়া পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বা সংকট কাটিয়ে উঠতে যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি বিশ্ব বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য নতুন কোন স্থিতিশীল ভিত্তি তৈরি করতেও ব্যর্থ হয়েছে। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণেই কখনো কোন দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীল ব্যবস্থার জন্ম দেওয়া সম্ভব না। বরং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে অভ্যন্তরীণ সংকটে দীর্ণ। অসংখ্য সামরিক অস্ত্র-সস্ত্রে নিজেকে সজ্জিত করেও-আন্তর্জাতিক অস্থিতিশীলতার সবচেয়ে বড় উৎসে রূপান্তরিত হয়েছে। 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' তৈরির প্রচেষ্টায় শুধুমাত্র বিশ্বব্যাপী নতুন নতুন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে সফল হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি যুদ্ধাভিযান শুধুমাত্র মানবিক বিপর্যয় ডেকে আনেনি, তার সাথে সাথে অপ্রত্যাশিত এবং বিপর্যয়কর জটিলতার জন্ম দিয়েছে।

কারণ, এতসব করেও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো লগ্নিপুঁজি উদ্বৃত্ত মূল্যকে যে হারে পুঁজির সঞ্চয়ন (accumulation) ঘটায় তার বিনিয়োগের সমস্যার সমাধান আজও করতে পারেনি এবং করা সম্ভবও নয়। বিনিয়োগের সুযোগ না পেয়ে এই সঞ্চিত পুঁজি ফটকা বাজারে প্রবেশ করে তাকে ফেঁপে ফুলে উঠতে সাহায্য করছে। কিন্তু ফটকা পুঁজির বাজার যে কতটা অনিশ্চয়তায় ভরা এবং সমগ্র

বিশ্বের সাধারণ মানুষের জন্য কতটা বিপজ্জনক তার প্রমাণ হলো ২০০৮ সালের 'সাব-প্রাইম ক্রাইসিস'। কত মানুষ যে নিঃস্ব হয়েছেন, কত মানুষ যে গৃহহারা হয়েছেন, কত মানুষ যে তাদের সঞ্চিত শেষ সম্পদটুকুও হারিয়ে পথের ভিখারিতে পরিণত হয়েছেন তার কোন হিসেব জানা নেই। ২০০৮ সালে বিশ্ব অর্থনীতির ভয়ংকর বিপর্যয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কসের মূল্যবান বিশ্লেষণ এবং কমিউনিস্টদের দাবিকে সত্য বলে বিশ্বের জনগণের কাছে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই সামাজিক অস্থিরতা ডেকে আনে এবং এই সংকটের সময় যে বিপুল পরিমাণ সম্পদের অপচয় ঘটে — যে কথা মার্কস বারংবার উল্লেখ করেছেন — তাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা পুঁজিবাদের নেই। এই বিপর্যয়ের পরে জনগণের করের টাকায় গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে যেভাবে কর্পোরেট মালিকদের বাঁচিয়ে দেওয়া হলো এবং সাধারণ হতদরিদ্র মানুষের ঘাড়ে কৃচ্ছ্রসাধনের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হলো, তার মধ্যে যে সাধারণ মানুষের স্বার্থকে উপেক্ষা করা, তাদের প্রবঞ্চনা করা, তাদের প্রতি অন্যায় করাটাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়ম সেটা অত্যন্ত প্রকটভাবে ধরা পড়েছে।

এক সময়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ও পরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগান সরকারি খরচ কমানোর নামে যে সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ ছিল সেই সব ক্ষেত্রেও এই বেসরকারি পুঁজির বিনিয়োগের সুযোগ করে দিতে নতুন তত্ত্বের কথা বলতে শুরু করেছিলেন। ব্রিটেনে সরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা শিল্প, স্বাস্থ্য পরিষেবা বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া শুরু হয়। অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকার বেসরকারিকরণ ও বিলগ্নিকরণ শুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইভাবে বেসরকারিকরণের সুযোগ বেশি নেই কারণ সেখানে এমনকি সামরিক শিল্পও করপোরেট পুঁজির আওতায়। রোনাল্ড রেগান সংকট কমানোর জন্য অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা কমিয়ে তা আরও বেশি করে বাজারের উপর ছেড়ে দেওয়া ও ধনীদের উপর সরকারি করের ভার কমানোর পথ গ্রহণ করেন। অতীতে যে বুর্জোয়া গণমাধ্যমগুলি অর্থনীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপ ও সরকারি উদ্যোগে সামাজিক সুরক্ষার (বিশেষত ব্রিটেনের সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থার) গুণগান করতো তারাই ভোল পাল্টে বেসরকারিকরণ ও অর্থনীতিতে সরকারি ভূমিকা হ্রাসের পক্ষে ব্যাপক প্রচার শুরু করে।

কিন্তু, পুঁজিবাদের যে সংকট তার চরিত্র মার্কস অনেকদিন আগেই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন যে, এই সংকটের দুইটি দিক আছে—এক হলো অতিরিক্ত পুঁজির সঞ্চয়ন (over accumulation of capital) এবং দুই হলো অতি উৎপাদন (বুর্জোয়া অর্থনীতির ভাষায় under consumption)। উদ্বৃত্ত

মূল্যের যে পরিমাণ পুঁজিভবন (capitalisation) ঘটে তার উপযুক্ত লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ না পাওয়ার কারণ নিহিত আছে পণ্যের অতি উৎপাদনের সমস্যার মধ্যে। তাই বাণিজ্যের পরিমাণ প্রসারিত না হলে বা বাজার সম্প্রসারিত না হলে পুঁজি বিনিয়োগের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই। এহেন অবস্থায় পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা মনে করেছিল যে 'বিশ্বায়ন'-এর মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিশাস্ত্রে উন্নয়ন ও বিকাশের দুই ধরনের তত্ত্ব জানা ছিল। এক ছিল আমদানির উপর নির্ভরশীলতা কমাও, নিজের দেশের শিল্পকে বাইরের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করো – জাতীয়তাবাদী আবেগে সুড়সুড়ি দিতে বুর্জোয়া ধুরন্ধরেরা যাকে গালভরা নামে ডাকে 'আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি' বলে, আর পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভাষায় বলা হয় 'import substitution theory'। দ্বিতীয় যে তত্ত্ব তা হলো পণ্য রপ্তানির ভিত্তিতে বিকাশ বা 'export-led growth theory'। কিন্তু এই পদ্ধতি সেই সমস্ত দেশের পক্ষে অনুকূল রপ্তানি বাণিজ্যে যাদের কোন কোন পণ্যের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক সুবিধা (comparative advantage) আছে। বিশ্বের প্রায় সমস্ত পুঁজিবাদী দেশই দীর্ঘদিন ধরে নিজের দেশের শিল্প, বিশেষত সেই সমস্ত ক্ষেত্র যেখানে অপর কোন দেশের পণ্যের তুলনায় রপ্তানির জন্য আপেক্ষিক সুবিধা (comparative advantage) নেই, তাদেরকে বাইরের অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করতে শুল্ক-প্রাচীর তৈরি করার নীতি অনুসরণ করে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই, একটা দেশে শুল্কের বাঁধা না থাকলে যে পরিমাণ পণ্য বাজারজাত করা সম্ভব, শুল্কের বাঁধা থাকলে সামগ্রিক পরিমাণ অনেক কমে যায়। সাম্রাজ্যবাদীরা এই সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে মনে করল যে, যদি সমস্ত দেশকে শুল্ক প্রাচীর তুলে দিয়ে পুঁজি ও পণের অবাধ চলাচলের বাণিজ্যনীতিতে সম্মত করা যায় তবে বাজারের সম্প্রসারণ ঘটবে এবং সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। তারা সেই দ্বিতীয় তত্ত্বের-export-led growth theory-গা থেকে ধুলো ঝেড়ে বাইরে বের করে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করতে শুরু করল যেন একটা নতুন তত্ত্ব পাওয়া গেছে—নাম দিল বিশ্বায়ন। বস্তুতপক্ষে তত্ত্ব হিসাবে এ নতুন কিছুই নয়, এমনকি আধুনিক অর্থনীতির জনক যাদের বলা হয় — অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, জেমস মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ অর্থনীতিবিদের আমল থেকেই তা জানা ছিল। তৈরি হলো WTO, বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্কের নির্দিষ্ট পরিমাণ বেঁধে দেওয়া হলো এবং সমস্ত দেশকে বাধ্য করা হলো রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতি অনুসরণ করতে, লগ্নিপুঁজির সঞ্চলনকে করা হল অবাধ-দেশের গণ্ডি আর কোন বাঁধা রইল না।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশ, যারা অত্যন্ত গরিব, যারা পিছিয়ে পড়া, যাদের কারিগরী জ্ঞানের অভাব আছে, প্রযুক্তি যাদের নাগালের মধ্যে নেই, দক্ষ শ্রমশক্তি নেই, প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদনের পরিকাঠামো নেই, সেই সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতির কি ফল হতে পারে? শিল্পোন্নত দেশগুলোর মতো তাদের শিল্পজাত পণ্য বা পরিষেবা রপ্তানির সক্ষমতা না থাকায় তারা রপ্তানি করতে পারে কাঁচামাল হিসাবে একমাত্র তাদের দেশের সম্পদ। এই ভাবেই বিশ্বায়নের নামে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলোকে সস্তায় সারা বিশ্বের সম্পদ লুণ্ঠনের সুযোগ করে দেওয়া হলো। তার পরিবর্তে শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের শিল্পজাত পণ্যের বাজারকে সম্প্রসারিত করার সুযোগ পেলো। কিন্তু এত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পরিত্রাণের রাস্তা খুঁজে WTO তৈরি করে যে বুঝাপড়া গড়ে উঠল গত শতাব্দীর আট-নয়ের দশকে — সেই সাধের বুঝাপড়া আজ ভেঙে পড়ছে। চীনের সাথে আমেরিকার, আমেরিকার সাথে ইউরোপের, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে ব্রিটেনের শুল্ক নিয়ে, বাণিজ্য নিয়ে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠছে। ফলে বিশ্বায়ন করে সংকট নিরসনের পরিবর্তে তা আরও গভীর অসুখে পরিণত হয়েছে।

বর্তমান সময়ে পুঁজিবাদের সমর্থক কমিউনিস্ট বিদ্বেষীরা বা তাদের ভাড়া করা বুদ্ধিজীবীরা প্রযুক্তির বিপুল অগ্রগতির মধ্যে পুঁজিবাদের সংকট কাটিয়ে উঠে স্বর্ণালী দিনের গল্প শোনান আমাদের। ইন্টারনেট পরিষেবা, কম্পিউটার, স্মার্ট ফোন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence বা সংক্ষেপে AI) ইত্যাদির মাধ্যমে নাকি সংকট কাটিয়ে ওঠা যাবে এবং পৃথিবী এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। মার্কস পুঁজির জৈব গঠন (organic composition of capital) আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন যে, পুঁজিপতিদের উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে যে পুঞ্জিভবন ঘটে সর্বদা তার অধিকাংশ তাঁরা বিনিয়োগ করে স্থির পুঁজির (constant capital) ক্ষেত্রে। স্থির পুঁজিতে অধিকতর হারে বিনিয়োগের অর্থ হলো উৎপাদন পদ্ধতিকে অধিকতর যন্ত্রীকরণ। উন্নত প্রযুক্তি, নতুন নতুন যন্ত্র এনে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে, তার সাথে স্থির পুঁজির সাপেক্ষে সচল পুঁজির পরিমাণ কমতে থাকে। সচল পুঁজি (variable capital) অর্থাৎ মজুরি স্থির পুঁজির তুলনায় যত হ্রাস পায়, তত তাঁরা অধিকতর উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির দিকে ছোটে। বলা বাহুল্য, এর জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং উদ্বৃত্ত (surplus) বৃদ্ধি পায় ঠিকই। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কম্পিউটার, রোবটের মতো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ করলে উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কমে, এই ঘটনা তো আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু আপেক্ষিক অর্থে

মজুরির সামগ্রিক পরিমাণও কমে—অর্থাৎ যে হারে স্থির পুঁজির বৃদ্ধি ঘটে তার তুলনায় মজুরির সামগ্রিক পরিমাণ কমে যেতে থাকে। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে যা ঘটে তা মার্কসের দূরদৃষ্টিকেই সঠিক বলে প্রমাণ করে। মার্কস বলেছিলেন, এই প্রক্রিয়ায় এক দ্বন্দ্বেরও তৈরি হয়। শ্রমিকের মোট আপেক্ষিক আয় কমে গেলে বাজারে ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়, বাজার সম্প্রসারণের পরিবর্তে বাজার সংকুচিত হয়ে পড়ে। বাজারে পণ্যের চাহিদার ঘাটতি দেখা দেয়, পুঁজিবাদ আরও বেশি করে অতি-উৎপাদনশীলতার (under consumption) গভীর সংকটে পড়ে। মার্কসের এই কথা আজ শুধু আমাদের মতো কমিউনিস্ট দলগুলো বলছে তা নয়, সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাদী দুনিয়ার অর্থনীতিবিদের অনেকে এই আশঙ্কা ব্যক্ত করছেন। অর্থাৎ, রোবটিক্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ বাজারকে সংকুচিত করছে, বৈষম্যের হারকে তীব্র করে তুলছে, সংকটকে আরও গভীর খাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

২০১৯ সালের ১৬ মার্চ 'দ্য ইকনমিস্ট' (যাকে দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের প্রতিভূদের, বিশেষভাবে পশ্চিমী বুর্জোয়াদের মুখপত্রই বলা চলে) একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল কীভাবে ইন্টারনেট অধিকতর মজুরির বৈষম্যের দিকে অর্থনীতিকে নিয়ে যাচ্ছে (How the internet led to greater wage inequality)। সেখানে বলা হয়েছে যে, 'অর্থনীতিবিদরা দীর্ঘকাল ধরে বৈষম্যের পিছনে অন্যতম চালিকা শক্তি হিসাবে 'দক্ষতা-নির্ভর প্রযুক্তিগত পরিবর্তন'('skill-biased technological change')-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু (বুর্জোয়া) রাজনীতিবিদরা যাদের কাছে প্রযুক্তির উপকারিতা বা কার্যকারিতা দেখানোই গুরুত্বপূর্ণ, তাঁরা নিয়মিতভাবে বলে আসছেন যে বৈষম্যের কারণ হলো অভিবাসন বা আমদানিকৃত কম দামের পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা। এখন যখন শিক্ষাবিদরা ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা এবং বৃহত্তর অর্থনীতির উপর প্রযুক্তির প্রভাব নিয়ে আলোকপাত করছেন তখন প্রযুক্তিই যে প্রকৃতপক্ষে অপরাধী তার শক্তিশালী প্রমাণ উঠে আসছে'।

বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই অবশ্য শ্রমিকশ্রেণির কেউ এই রায় শুনে খুব বেশি অবাক হবেন না, কারণ দীর্ঘ কয়েক শতকের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা জানেন যে, পুঁজিবাদে প্রযুক্তি কখনো বৈষম্য দূর করতে পারে না।

ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির একজন প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদ ড্যারন অ্যাসেমোগ্লু (Daron Acemoglu) অর্থনীতিতে অটোমেশনের প্রবণতা

নিয়ে তাঁর গবেষোণাপত্রে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাকে ভিত্তি করে নিউ-ইয়র্ক টাইমস, ১১ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে এক প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন মেশিন এবং সফটওয়্যারে বিনিয়োগের অর্থনীতি থেকে যে ফলাফল লাভ করা যায় তা নিদারুণ প্রবঞ্চনাময়। তিনি বলেছেন যে, এই বিনিয়োগের ফলে বৈষম্য ক্রমবর্ধমান, অথচ সরকারি নীতি যে তাদের উৎসাহিত করছে তা স্ফটিকের মতোই স্পষ্ট। গত ৪০ বছরে মার্কিন শ্রমিক ও কর্মীদের মধ্যে মজুরির ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের অর্ধেক বা তার বেশি অংশের জন্য দায়ী হলো উৎপাদন প্রক্রিয়ার কাজের স্বয়ংক্রিয়তা, যে কাজ আগে মানুষ করত।

অধ্যাপক অ্যাসেমোগ্লুর সাম্প্রতিককালে একাডেমিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ তাকে অর্থনীতি শাস্ত্রের সবচেয়ে আলোচিতদের মধ্যে অন্যতম একজন পণ্ডিত অর্থনীতিবিদ হিসাবে পরিচিত করে তুলেছে। তবে, তিনিই একমাত্র বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ নন যিনি বলছেন যে, কম্পিউটারাইজড মেশিন এবং সফটওয়্যার প্রয়োগ পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকটের কারণ হয়ে উঠছে এবং ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন মতের অধ্যাপক গবেষকদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত অগ্রগতি ঘিরে সমালোচনার কোরাসে তাদের কণ্ঠস্বরও যুক্ত হচ্ছে। যেমন পল রোমার (Paul Romer), যিনি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর তার কাজের জন্য অর্থনৈতিক বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এরিক ব্রাইনজলফসন (Erik Brynjolfsson), স্ট্যানফোর্ডের একজন অর্থনীতিবিদ, যিনি এই প্রবণতাকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পক্ষে ফাঁদ বলেছেন — 'টুরিং ফাঁদ' (Turing Trap)। অ্যালান টুরিং হলেন ব্রিটেনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পথিকৃৎ।

অতএব উৎপাদন পদ্ধতিকে অধিকতর যান্ত্রিকীকরণ এবং বিশ্বায়ন পুঁজিবাদের বাজার সংকট নিরসনের অভিনব পন্থা হয়ে আসেনি, এসেছে পুঁজিবাদের মরণ-ফাঁদ হিসাবে। তীব্রতর সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি যে সমস্ত নতুন সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নিয়েছে তা সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রের কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়নি যা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে বিশ্বায়নের যুগে লগ্নিপুঁজির সংকটের নিরসন হয়েছে। লেনিন বর্ণিত পাঁচটি লক্ষণ আজ বিশ্বায়নের মধ্যে আরও প্রকট। প্রথমত, পুঁজির একচেটিয়াকরণ আজ অকল্পনীয় মাত্রায় পৌঁছেছে। এমন অনেক মার্কিন কর্পোরেট সংস্থা আছে যাদের বাৎসরিক আয় বাংলাদেশের মতো গোটা দশেক দেশের মোট আয়ের সমান। দ্বিতীয়ত,

গোটা বিশ্বের ব্যাংকগুলির সমান্তরালভাবে গড়ে উঠেছে অত্যন্ত ক্ষমতাধর আর্থিক প্রতিষ্ঠান (financial institutions)। ফাইনান্স ক্যাপিটালের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। পশ্চাদপদ দেশগুলির সম্পদ লুণ্ঠনে অগ্রসর দেশের লগ্নিপুঁজির প্রধান বাহক হল উন্নয়নের নামে ঋণ দেওয়া এই সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো।। লেনিন দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদের শুরুর যুগে ব্যাংকগুলি বাণিজ্যিক লেনদেন করত এবং জমা টাকাকে পুঁজিতে রূপান্তরিত করত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের যুগে ব্যাংকগুলি শিল্পপুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে লগ্নিপুঁজির জন্ম দেয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বৃহৎ পুঁজির প্রতিষ্ঠানগুলোর মার্জার অ্যাকুইজিশন ঘটছে, অতি বৃহৎ পুঁজি পরস্পর হাত মেলাচ্ছে এবং তুলনায় ক্ষুদ্র পুঁজিকে গিলছে।

তৃতীয়ত, বিশ্বব্যাপী পুঁজি রপ্তানি অতীতের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অনেকেই বলছেন যে, আজ পুঁজির অবাধ চলাচলের কারণে যে কোন দেশই আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে তাদের পুঁজি রপ্তানি করতে পারে, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের NYSE বা NASDAQ-এর মতো স্টক এক্সচেঞ্জে নাম নথিভুক্ত করে সেখান থেকে পুঁজিও সংগ্রহ করতে পারে। এটা দেখিয়ে অনেকে বলছেন, বিশ্বায়নের সুযোগে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুঁজিবাদী দেশও শিল্পোন্নত দুনিয়ায় পুঁজি পাঠাবার সুবিধা পাচ্ছে। কিন্তু, এই সুবিধা নিতে হলে পুঁজির জোর দরকার—অর্থাৎ, নিজের দেশের বিশ্বের ভরসাযোগ্য স্টক-মার্কেট গড়ে ওঠার জন্য অসংখ্য কোম্পানি দরকার, সেই স্টক মার্কেটে নিত্যদিন বিলিয়ন ডলারের কেনা-বেচা দরকার। শিল্পোন্নত দেশে পুঁজিলগ্নির বা পুঁজি সংগ্রহের যে রাস্তা কাগজে-কলমে খুলে গেছে, সে রাস্তায় যাওয়ার যেমন ক্ষমতা থাকা দরকার তা অনুন্নত ও পশ্চাদপদ দেশগুলির নেই। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এটা সেই শেয়াল আর বকের গল্প। বককে দাওয়াত দিয়ে প্লেটে করে স্যুপ খেতে দেওয়ার মতো।

চতুর্থত, লেনিন যে একচেটিয়া গোষ্ঠীর জোট-এর কথা বলেছিলেন বর্তমানে বিশ্বব্যাংক (IBRD), আইএমএফ, আইডিএ, এডিবি ইত্যাদি প্রত্যেকটি আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থা এরই সম্প্রসারিত ও কেন্দ্রীভূত রূপ।

পঞ্চমত, প্রত্যক্ষভাবে পরদেশ দখল না করেও অন্যদেশের ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াদের সাথে যোগসাজশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অনুপ্রবেশের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ যে সম্ভব — যা লেনিন দেখিয়ে গিয়েছিলেন — বর্তমানে নয়া ঔপনিবেশিকতা তা থেকে পৃথক নয়।

নয়া-ঔপনিবেশিকতার যে ধারণা লেনিন দিয়েছেন, সেই নয়া-ঔপনিবেশিকতাই বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্রাধান্য নিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ নয়া-ঔপনিবেশিকতার তত্ত্বগত সম্প্রসারণ ঘটেছে। আবার পূর্বতন ব্রিটিশ উপনিবেশে বেড়ে ওঠা ভারতের অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বুর্জোয়াশ্রেণি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় তার নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে ও আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে। এ ব্যাপারে ভারত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে এগুচ্ছে। লেনিনই দেখিয়েছেন — বিশ শতকের শুরুতে পর্তুগাল সাম্রাজ্যবাদী দেশ হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার নিজস্ব স্বার্থে উপনিবেশসহ পর্তুগালের রক্ষাকর্তা হিসাবে কাজ করছিল। অর্থাৎ বর্তমান যে যুগে আমরা বাস করছি তা চরিত্রের দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগ। পার্থক্য শুধু এই, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদের সংকট যত বেড়েছে ততই পশ্চাদপদ দেশগুলোর ওপর তাদের নয়া-ঔপনিবেশিক আক্রমণ আরও শাণিত হয়েছে। সেই আক্রমণ যেমন বিশ্বায়ন, বেসরকারিকরণের ফতোয়া দিয়ে আসছে তেমনি আসছে সাম্রাজ্যবাদী সশস্ত্র হানাহানির মধ্য দিয়ে। দু ধরনের আক্রমণের লক্ষ্য একটাই — তা হলো, পণ্যের বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং সস্তা শ্রমশক্তি ও কাঁচামাল লুণ্ঠন। বিশ শতাব্দীর শেষভাগে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতন সাম্রাজ্যবাদকে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ও অবাধে আক্রমণ করার সুযোগ করে দিয়েছে।

ইসরাইল ও মধ্যপ্রাচ্য : আরব বসন্ত ও 'আই-এস'-এর উত্থান

তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের দখলে থাকা ১০,৪২৯ বর্গ মাইলের ফিলিস্তিন ভূখণ্ড প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দখলে যায়। ১৯১৯ সালে ফিলিস্তিন জনসংখ্যার প্রায় সবই ছিল আরব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব থেকেই ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষেরা আসতে শুরু করে ব্রিটিশদের সহায়তায়। এর বিরুদ্ধে আরবদের বিক্ষোভও চলে। ১৯২১ সালে মধ্যপ্রাচ্যে তেলের বিশাল ভান্ডার আবিষ্কার হয়। তেল সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অংশ হিসেবে দখলদার ব্রিটিশ জায়নবাদী ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। কারণ আরব জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদী তেল লুণ্ঠনের পথে প্রধান বাঁধা। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় ফিলিস্তিন ভূখণ্ড দ্বিখণ্ডিত করা সংক্রান্ত ১৮১নং প্রস্তাব গৃহীত হয়। যার মধ্যমে মোট ভূমির ১০ শতাংশের মালিক হয়েও ৫৫ শতাংশের মালিক হয়ে যায় ইসরায়েলিরা। আর ফিলিস্তিনিরা পায় ৪৫ শতাংশ। বাস্তবে এখন প্রায় ৮০ ভাগ ফিলিস্তিন

ভূখণ্ড ইসরাইলের দখলে এবং তারা প্রতিদিন ফিলিস্তিনিদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে চলেছে। ফিলিস্তিনিরা এখন নিজ ভূমিতে ছোট দুটি ছিটমহলের মতো পশ্চিম তীর ও গাজাতে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পরবাসী হয়ে চরম মানেবতর জীবনযাপন করছে। ফিলিস্তিনিদের ইতিহাস ও সংকট সারা পৃথিবীর মানুষ জানে। তুর্কি অটোমান থেকে ব্রিটিশ হয়ে বর্তমানে মার্কিন মদদে ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ এর কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠিত হয়নি বা করতে দেওয়া হয়নি। সারা বিশ্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ ২/১টি দেশ মধ্যপ্রাচ্যে কৃত্রিমভাবে তৈরি ইসরায়েলের জায়নবাদী সরকারকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যে বা আরব অঞ্চলে তেল সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা বিশ্ব আরব দেশগুলোতে যাতে আরব জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি বিকশিত না হতে পারে তার জন্য সব ধরনের চক্রান্ত অব্যাহত রাখে। যার অংশ হিসেবে ইসরায়েলকে সামরিক ও আর্থিক দিক থেকে শক্তিশালী করা, তাদের সমস্ত অবৈধ কর্মকাণ্ডের অনুমোদন দেওয়াই হলো তাদের কর্মসূচির একটি দিক, অপরদিকে নিজেরা গণতন্ত্রের আওয়াজ তুললেও সৌদি আরব, জর্ডান, আরব আমিরাত, কুয়েতসহ বেশ কিছু দেশে চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রকে প্রশ্রয় দান। এই কর্মসূচির প্রকাশ ঘটে 'সিআইএ'-র চক্রান্তে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা ইরানের মোসাদ্দেক ও মিশরের আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করে গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাত করা। এর মাধ্যমে ইরানে রাজতান্ত্রিক শাহ সরকার হটিয়ে ইসলামি খোমেনি সরকার ও মিশর, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়াসহ বেশ কিছু দেশে সামরিক বা তাদের সমর্থিত সরকার প্রতিষ্ঠিত করা। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন আরব জাতীয়তাবাদের সমর্থনে এগিয়ে আসলে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইরাক, সিরিয়া ও লিবিয়ায় বাথ পার্টির নেতৃত্বে আধুনিক, কল্যাণমুখী ও সেক্যুলার সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল।

সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে আরব বসন্ত শুরু হয় মুলত, তিউনিসিয়ায় এক হকারকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে। যা পরবর্তী সময়ে মিশরে ছড়িয়ে পড়ে। আরব লীগের ২২টি দেশ — যাদেরকে আরব জাতির অর্ন্তভুক্ত বলা হয় — সেখানকার বেশিরভাগ দেশেই রাজতন্ত্র ও কর্তৃত্ববাদী-সামরিক সরকারগুলো দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে চরম লুটপাট, দুর্নীতি ও ভোগবাদে নিমজ্জিত। দেশে যাতে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন বা ভিন্নমত গড়ে না উঠে

তার জন্য তারা চরম স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ পরিচালনা করে। এ সব দেশে কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দলকেও গড়ে উঠতে দেয়নি। ফলে বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বিস্ফোরণ আকারে আরব বসন্তের জন্ম দেয় এবং পশ্চিমাদের সমর্থিত তিউনিসিয়ায় বেনী ও মিশরের হোসনী মোবারক সরকার উচ্ছেদ হয়। আরব বসন্তের আওয়াজ তুলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্ব আরব জাতীয়তাবাদের সর্বশেষ হুমকি সিরিয়া ও লিবিয়ায় 'আইএস'-সহ নানা মুসলিম মিলিশিয়া বাহিনী তৈরি করে। যেমন করে আফগানিস্থানে সোভিয়েত সমর্থিত নজিবুল্লাহ সরকারকে উচ্ছেদ করতে পাকিস্তানের সহায়তায় মৌলবাদী তালেবান মিলিশিয়া বাহিনী তৈরি করে। তাদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সিরিয়া ও লিবিয়া সরকারকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে। লিবিয়ায় মুয়াম্মার আল গাদ্দাফিকে হত্যা করে তারা সফল হলেও সিরিয়ায় এখন পর্যন্ত সফল হতে পারেনি। ইরাক ও সিরিয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে মার্কিন ও ইসরায়েলের অস্ত্র, অর্থ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে 'আইএস' রাষ্ট্র তৈরি করে। সিরিয়ায় 'আইএস' মিলিশিয়া দিয়ে ভিতর থেকে আসাদ সরকার উৎখাত করার চেষ্টা করা হয়। মার্কিন বিমান হামলা ও' আইএস'-সহ বিভিন্ন মিলিশিয়া গ্রুপের হামলায় প্রায় বিধ্বস্ত সিরিয়ায় রাশিয়া তার স্বার্থে হস্তক্ষেপ, সৈন্য প্রেরণ ও দখলকৃত সিরিয়ায় বিভিন্ন মিলিশিয়া গ্রুপের উপর পাল্টা হামলা চালালে পুরো দৃশ্যপট পরিবর্তন হতে শুরু করে। আসাদ সরকার এখন অনেকটাই স্থিতিশীল, তবে বেশ কিছু এলাকায় এখনও 'আইএস'-সহ বিভিন্ন মিলিশিয়া বাহিনী তৎপর আছে। আইএস-মার্কিন-ইসরায়েল-পশ্চিমা আতাত স্পষ্ট হলে মার্কিনিরা নিজেদের অপকর্ম আড়াল করতে ইরাকে 'আইএস'-এর উপর হামলা শুরু করলে তারা গুটিয়ে পড়ে। লিবিয়ায় গাদ্দাফি হত্যাকণ্ডের পর গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ফলে এখন লিবিয়া কার্যত দুটি সরকার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। একটি রাজধানী ত্রিপোলিকে কেন্দ্র করে একটা অঞ্চলে জাতিসংঘ সমর্থিত সরকার। যাকে সাহায্য করছে তুরস্ক সরকার। অপরদিকে লিবিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ও বড় বন্দর বেনগাজিকে কেন্দ্র করে একটা অঞ্চল মিশর, কাতার সমর্থিত গাদ্দাফির সাবেক জেনারেল খলিফা হাফতার সমর্থিত সরকার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছে। এক সময়ের সমৃদ্ধ লিবিয়া এখন গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত। কোন রাজনৈতিক শক্তি না থাকায় মিশরে মৌলবাদী মুসলিম ব্রাদারহুড ও তিউনিসিয়ায় নির্বাচনের মাধ্যমে ঐক্যমত্যের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে মুসলিম ব্রাদারহুড সরকারকে উৎখাত করে পশ্চিমা সমর্থিত সামরিক বাহিনী মিশরের ক্ষমতা দখল করে। ইরাকে আগেই জীবাণু অস্ত্রের ধুয়া তুলে সাদ্দাম সরকার

উৎখাত হয়। এখন ইসরায়েল সরকারের সাথে জর্ডান, সৌদি, মিশর, কুয়েত, কাতারসহ বেশিরভাগ দেশের কুটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে। আরব বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা বিশ্বের ও ইসরায়েলি জায়নবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তি ক্রমাগত দুর্বল হয়ে আসছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন আঁতাত এবং সংঘাত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পশ্চিমা বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রেট ব্রিটেন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে চলে যায়। আর বিশ্বব্যবস্থা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে — একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা আর অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের পর গোটা বিশ্বে কর্তৃত্ব এক মোড়লের হাতে চলে যায়। কিন্তু ২০০৮ সালের বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থায় বিপর্যয় নেমে এলে আমেরিকা যে পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল, চীনের উপর তার প্রতিঘাত হয়েছিল তুলনামূলকভাবে কম। এই সুযোগে চীনের উত্থানের শুরু হয় এবং মার্কিন একমেরু বিশ্বের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে বহুমেরু (multi-polar) বিশ্বের পূর্বাভাস স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। বাইডেন ক্ষমতায় এসে পুনরায় বিশ্বে মার্কিন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার ঘোষণা দিয়েছেন এবং এরজন্য তিনি পশ্চিমা বিশ্বকে সাথে নিয়ে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছেন। একদিকে মার্কিন, কানাডা, ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন — জার্মান ও ফ্রান্সের নেতৃত্বাধীন, অপরদিকে চীন, রাশিয়া, তুরস্ক ও ইরান-এই রকম একটা মেরুকরণের (polarisation) ছবি সামনে আসছে। যদিও এই বিষয়ে এখনই চূড়ান্ত কথা বলার মতো সময় আসেনি, কারণ প্রত্যেকটি পশ্চিমা রাষ্ট্রের পণ্যের বাজার ও কাঁচামালের উৎসের উপর দখলদারিত্বের প্রশ্নে নিজের নিজের এজেন্ডা আছে এবং তা নিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে।

এই দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে চলেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য ও বাজারের স্বার্থের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে, আর্থিক পরিস্থিতি, জাত্যাভিমান ও মার্কিন-ইংল্যান্ড প্যাক্টের কারণে EU থেকে ইংল্যান্ডের বেরিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে (ব্রেক্সিট)। সাম্রাজ্যবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদ দ্বন্দ্বে যেমন আমেরিকার স্বার্থের সাথে EU স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে, আবার তেমনি ইউরোপের কর্তৃত্ব জার্মানি না ফ্রান্স কার হাতে থাকবে সেটা নিয়েও তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। ব্রিটেনসহ ইউরোপ ঐক্যবদ্ধ থাকলে শিল্পজাত পণ্য বাজার দখলের ক্ষেত্রে জার্মানি ও ফ্রান্স যতটা লাভবান হয়, তা ব্রিটেনের পক্ষে বরং

ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ব্রিটেনের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির সমস্যা বিশ্লেষণের জন্য ব্রিটিশ সরকার একটি কমিশন গঠন করেছিল যাদের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালের অক্টোবরে। সেই রিপোর্টে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্রিটেনের এই আপেক্ষিক ক্ষতির দিকটি এবং তাদের দ্বন্দ্বের উৎস বোঝা যায়। সেখানে দেখানো হয়েছে —

> ১৯৯১ সালে যুক্তরাজ্যের পণ্য রপ্তানি ছিল মোট বৈশ্বিক রপ্তানির ৫.২ শতাংশ, যা ২০১১ সালে হ্রাস পেয়ে এসে দাঁড়ায় মাত্র ২.৬ শতাংশে। ...সামগ্রিক বিচারে, ২০০০ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে যুক্তরাজ্যের রপ্তানির উৎপাদন মূল্য ৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, উৎপাদন রপ্তানিতে যুক্তরাজ্যের আপেক্ষিক পতন গত দশকে শুধুমাত্র উদীয়মান অর্থনীতির কারণে নয় বরং ইউরোপীয় সদস্য রাষ্ট্রের (বিশেষ করে জার্মানি) কারণেই ত্বরান্বিত হয়েছে। (UK goods exports declined from a world share of 5.2% in 1991 to 2.6% in 2011. ... In absolute terms, the value of UK manufacturing exports grew by 46% between 2000 and 2011. However, the UK's relative decline in manufacturing exports appears to have accelerated in the last decade, not only vis-à-vis emerging economies but also relative to European peers (especially Germany). 'Winning the Future Markets for UK Manufacturing Output'- p4)

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ এই দ্বন্দ্বকে আবার USA নিজের স্বার্থের অনুকূলে কাজে লাগাতে চায় বলেই সে ব্রেক্সিটের পক্ষে ছিল। IMF-এর প্রকাশিত সর্বশেষ World Economic Outlook Report- 2021 অনুযায়ী মোট দেশিয় উৎপাদনের (GDP at constant price) বিচারে এখন অর্থনীতির আকারের দিক থেকে চীন (১৬.৮৬২ ট্রিলিয়ন ডলার) সমগ্র ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (১৭.০৭৮ ট্রিলিয়ন ডলার) সামান্য কম হলেও ইউরো জোনকে (১৪.৫১৮ ট্রিলিয়ন ডলার) ছাড়িয়ে গেছে এবং একক দেশ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের (২২.৯৩৯ ট্রিলিয়ান ডলার) পরেই তার স্থান। চীনের এই ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি আবার অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের বিশ্বের একচ্ছত্র কর্তৃত্বকারী ভূমিকার পক্ষে বিপজ্জনক এবং তাদের বাণিজ্য স্বার্থের পরিপন্থি বলেই মনে করে। এই কারণে তাদের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জের হাত থেকে রক্ষা করতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব EU-কে তার পাশে

চায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নাজুক অবস্থা EU বোঝে বলেই এই দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে EU যেমন তার কাছ থেকে নানা সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে গঠিত ন্যাটোকে শক্তিশালী করা নিয়ে মার্কিন নীতিকে তাদের মেনে নিতে হয়। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ সংক্রান্ত নানা আন্তর্জাতিক ইস্যুতেও এ বিষয়গুলো অনেক পরিষ্কার বোঝা যায়।

অর্থাৎ, বিশ্বায়ন পরবর্তী পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে আমেরিকার সখ্যতা যতটা মোহময় আকারে প্রচার করা হোক না কেন, অথবা ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্ন্তভুক্ত সদস্য দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে যতই ভ্রাতৃত্বের ছবি তুলে ধরুক না কেন, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বের উপস্থিতি তারা কিছুতেই আড়াল করতে পারছে না।

ল্যাটিন আমেরিকান পরিস্থিতি

সমগ্র বিশ্বে USA কর্তৃত্ব করলেও তার নিজ মহাদেশ উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমরিকায় তার কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে বারে বারে। এর পেছনে বড় কারণ হচ্ছে তার নাকের ডগায় থাকা সমাজতান্ত্রিক কিউবা। যে কারণে USA গত ৬০ বছর অবরোধ করে কিউবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভাঙার চেষ্টা করছে। কিউবা এখনও গোটা বিশ্বের সামনে শিক্ষা, গবেষণা ও স্বাস্থ্যখাতে মডেল। কিউবা, কমরেড ফিদেল ক্যাস্ট্রো ও কমরেড চে-গুয়েভারার প্রভাব ঐ গোটা অঞ্চলের মানুষের মধ্যে রয়েছে। হুগো শ্যাভেজ বেঁচে থাকলে এই পরিস্থিতি আরও সংহত হতো। মাঝে একটা সময়ে কিছুটা পরিবর্তন হলেও করোনাকালে মোটা দাগে দেখলে কানাডা, কলম্বিয়া ও ব্রাজিল ছাড়া বেশিরভাগ দেশে বামপন্থি বা বাম মনোভাবাপন্ন মার্কিন বিরোধী সরকার ক্ষমতায়। ব্রাজিলের পরবর্তী নির্বাচনে বামপন্থি সরকার ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা বেশি। USA ল্যাটিন আমেরিকাকে নিয়ন্ত্রণে নিতে গিয়ে যে জায়গায় সবচেয়ে বেশি বাঁধা পেয়েছে তাহল এই অঞ্চলের মানুষের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বন্ধন, আদিবাসী ঐতিহ্য সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠী ও নৃতাত্ত্বিক বন্ধন।

অনেক বাম শক্তি, আমাদের দেশের এবং বাইরের, মনে করে বিপ্লব ছাড়াও নির্বাচনের মাধ্যমে বামপন্থিরা ক্ষমতায় আসতে ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তা বাস্তবায়নে যে কাজ করতে পারে ল্যাটিন আমেরিকার কোন কোন দেশ তার মডেল। সারা বিশ্বের ন্যায় আমাদের দেশেও এ নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। লাটিন আমেরিকার বাম আন্দোলনের সাথে আরও প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়া গেলে এ বিষয়ে নিশ্চয় নতুন অভিজ্ঞতা হবে, কিন্তু শুধুমাত্র সংসদীয় পথে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের

বিপজ্জনক সংশোধনাবাদী চিন্তা, যা ক্রুশ্চেভ আমল থেকে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে এসেছিল, তা সংশোধনবাদী চিন্তা নয় বলার মতো যুক্তিসঙ্গত কোন অভিজ্ঞতা আজো কোথাও ঘটেনি। বরং, চিলি, ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতা বলে যে, এই সম্পর্কিত মার্কস-লেনিনের সতর্কবার্তাকে উপেক্ষা করে যাঁরাই সংসদীয় পথে ক্ষমতা দখল করতে গিয়েছিল তাঁরা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। সংসদীয় পথে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করা, আর শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা এক কথা নয়। মার্কসবাদী দর্শনের সাথে পরিচিত যে কোন সাধারণ কর্মীও জানেন এবং অবশ্যই পাঠ করেন লেনিনের *রাষ্ট্র ও বিপ্লব* বইটি। সেখানে লেনিন আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্র এবং তার নানা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ইতিহাসের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মার্কসের বৈজ্ঞানিক ধারণা কালক্রমে কীভাবে পরিণত হয়েছে। লেনিন দেখিয়েছেন যে, মার্কস ইউটোপিয়ান ছিলেন না বলেই ১৮৪৮ সালের *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-এ সর্বহারা ক্ষমতা দখল করলে যে রাষ্ট্রকে গুড়িয়ে দেওয়া হবে তাকে কী দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হবে সে সম্পর্কে শুধুমাত্র একটা সাধারণ ধারণা দিয়েছিলেন — 'the state, i.e., the proletariat organised as the ruling class'। লেনিন বলছেন যে —

> মার্কস অপেক্ষা করছিলেন ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে ঋদ্ধ হওয়ার জন্য। ১৮৪৮-৫১ পর্বের বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte বইতে এসে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপিত করলেন, যে সমস্ত বিপ্লবই রাষ্ট্রযন্ত্রকে অধিকতর ত্রুটিহীন (perfected) করার চেষ্টা করেছে, প্রয়োজন ছিল একে ভেঙে ফেলা, গুড়িয়ে দেওয়া। [all previous revolutions perfected the state machine, whereas it must be broken, smashed. (Lenin, 1917, p-411)]

তবে, ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সংসদীয় লড়াইতে যেভাবে ক্রমাগত বামপন্থিদের প্রতি সমর্থন দেখা যাচ্ছে, তাতে একটি জিনিস অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাহলো, পুঁজিবাদী শাসন এবং শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বামপন্থিদের প্রতি মানুষ আস্থা পোষণ করছে। এই সমর্থনকে ভিত্তি করে আন্দোলনকে উচ্চ স্তরে উন্নীত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। এই কারণেই কিউবাসহ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে ও বিপ্লবী আন্দোলনে ল্যাটিন-আমেরিকা গোটা দুনিয়ার সামনে অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

মধ্য এশিয়া ও তালেবান উত্থান

আফগানিস্তানকে ব্যারেন ল্যান্ড ও ভার্জিন ল্যান্ড বলা হয়। ব্যারেন ল্যান্ড মানে হচ্ছে জনবসতিহীন আর ভার্জিন ল্যান্ড মানে হচ্ছে অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদ। এ ধরনের দেশ অনেকের কাছেই লোভনীয়। আফগানিস্তান, তুর্কেমেনিস্তান, কিরঘিস্তান, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান সবগুলো দেশ পাশাপাশি অবস্থিত। ধর্মের দিক থেকে মিল থাকলেও প্রত্যেকের আলাদা সংস্কৃতি বিদ্যমান। কাজাকিস্থানে পৃথিবীর প্রায় ৪০ ভাগ ইউরোনিয়ামের মজুদ আছে। বাকি দেশগুলোও প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ।

আফগানিস্তান ছাড়া বাকি দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আফগানিস্তানে সোভিয়েত সমর্থিত সরকার উৎখাতে পাকিস্তান সরকারের সহায়তায় মাদ্রাসা ছাত্রদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে মৌলবাদী তালেবান শক্তির উত্থান ঘটায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, তালেবান হোয়াইট হাউজে তৈরি। নিজের হাতের তৈরি কালসাপ যখন ফণা তুলে ৯/১১ সৃষ্টি করল বা ব্যবহৃত হলো, তখন তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আফগানিস্তান আক্রমন করে ও দখল করে। যদিও ৯/১১ হামলার সাথে যুক্ত ১৮ জনের ১৫ জনই ছিল সৌদি নাগরিক—যে সৌদি বাদশাহের পরিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষাকবচ নিয়ে টিকে আছে। দীর্ঘ ২০ বছর আফগানিস্তানে বহুজাতিক বাহিনীর নামে মার্কিনিদের পুতুল সরকার ক্ষমতায় ছিল। মার্কিন সমর্থন প্রত্যাহার করার পর আবার সেখানে তালেবান শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। বাস্তবে পুনরায় তালেবানদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার আয়োজন বেশ আগেই গোপনে করা হয়েছিল। আসলে তালেবান, বোকো হারাম, আল শাবাব, আইএস এগুলো সবই সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুল। ওরা এদেরকে ওদের প্রয়োজনমতো ব্যবহার করে ও কাজে লাগায়। আফগানিস্তান লাগোয়া সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ৪ টি দেশ নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের নানা চক্রান্ত আছে। এটা আবার রাশিয়াও জানে যে কারণে বেলারুশসহ ঐ দেশগুলো নিয়ে সেও একটা সামরিক প্যাক্ট ইতিমধ্যে করেছে। ফলে ভূরাজনৈতিক কারণে ও সম্পদ লুণ্ঠনের লিপ্সা ইত্যাদি সব মিলে রাশিয়া ও মার্কিনিদের ভেতরে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র হিসাবে বিরাজ করছে ঐ অঞ্চলটি।

ইউক্রেনকেন্দ্রিক বিবাদ – মহাযুদ্ধের কালো ছায়া

বর্তমানে ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে ইউরোপে বিরোধ চরমে উঠেছে। একদিকে রাশিয়া অভিযোগ করছে যে ইউক্রেনকে ন্যাটো জোটে অন্তর্ভুক্ত করে ঐ অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশ প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে যা

তার দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক, অন্যদিকে ইউক্রেনকে দখল করার উদ্দেশ্যে রাশিয়া সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করেছে এই অভিযোগে ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোর নিরাপত্তার স্বার্থে আমেরিকাও নতুন করে ইউরোপে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণ করেছে।

শুধু তাই নয়, ইউক্রেনের কাছে প্রচুর পরিমাণ আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্র বিক্রি করেছে। কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির মুখপত্র Granama ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় লিখেছে 'প্রেস রিপোর্ট অনুসারে, জানুয়ারী মাসে, ইউক্রেন ২২ তারিখে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৯০ টন এর বেশি প্রাণঘাতী অস্ত্র পেয়েছে; ২৩ তারিখে একই প্রদানকারীর কাছ থেকে আরও ৮০ টন এসেছে এবং দুই দিন পরে, ২৫ তারিখে, মার্কিন জ্যাভলিন অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল সিস্টেমের আরও ৮০ টন চালান সরবরাহ করা হয়েছিল।

এছাড়াও, বাল্টিক দেশগুলির প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের ইউক্রেনকে জ্যাভলিন মিসাইল, স্টিংগার ম্যান-পোর্টেবল এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম সহ মার্কিন তৈরি অস্ত্র সরবরাহ করার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ইউক্রেনীয় মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, কিয়েভ সম্প্রতি ৭০০টি জ্যাভলিন মিসাইল এবং ২,২০০টি এনএলএডব্লিউ ট্যাঙ্ক-বিরোধী ক্ষেপণাস্ত্র পেয়েছে।'(According to press reports, during the month of January, Ukraine received, on the 22nd, more than 90 tons of lethal weapons from the United States; on the 23rd another 80 tons arrived from the same provider, and two days later, on the 25th, another -80 ton shipment of U.S. Javelin anti-tank missile systems was delivered.

In addition, defense ministers of Baltic countries were authorized to supply Ukraine with US-made weaponry, including Javelin missiles, Stinger man-portable air defense systems, and other military equipment. According to Ukrainian media reports, Kiev has recently received 700 Javelin missiles and 2,200 NLAW anti-tank missiles.)

ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে বিরোধের কারণ একদিকে যেমন ভূরাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার, অন্যদিকে তেমনই ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সাম্রাজ্যবাদী দখল কায়েম করা। সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে কীসের

কারণে এই অঞ্চলের গুরুত্ব এবং তাদের উদ্দেশ্যই বা কি তা বোঝার জন্য মার্কিন নীতি নির্ধারকদের ভাবনা জানলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। ১৯৯২ সালে, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পতনের ঠিক পরে পরেই, 'World Policy Institute, the New School for Social Research'-এর একজন নেতৃস্থানীয় পররাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞ ওয়াল্টার রাসেল মিড *ওয়ার্ল্ড পলিসি জার্নাল*-এ একটি উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন, যার শিরোনাম ছিল 'আমাদের পতাকায় আরও বেশি "তারা" ঠান্ডা যুদ্ধের পরে মার্কিন নীতির জন্য একটি বিনয়ী প্রস্তাব।' ('More Stars In Our Flag: A Modest Proposal For U.S. Policy After The Cold War', World Policy Journal , Fall-Winter, 1992, Vol. 9, No. 4, pp. 581-598) প্রবন্ধের গোড়ার দিকে তিনি লিখেছেন —

> প্রকৃতপক্ষে, আমেরিকার বেশিরভাগ সমস্যার এবং বিশ্বেরও অনেকগুলোর একটি সহজ উত্তর আছে। আমাদের জটিল এবং আন্তঃসম্পর্কিত অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি এক ধরণের গর্ডিয়ান গিঁট তৈরি করেছে এবং এই গিঁট সম্পূর্ণভাবে খোলা সম্ভব। বাজেট ঘাটতি, বাণিজ্য ঘাটতি, ব্লু কলার শ্রমিকদের চাহিদা ও মজুরি কমে যাওয়া, তরুণ হাইস্কুল ও কলেজ গ্র্যাজুয়েটদের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগের অভাব, স্থবির অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর আমাদের নির্ভরতা: এই সব সমাধান করা যেতে পারে। এই সমাধান কাউকে আহত করবে না। (In fact, most of America's problems-and good many of the world's-do have an easy answer. Our complicated and interrelated economic problems form a kind of Gordian knot-and it is perfectly possible to cut it. The budget deficit, the trade deficit, falling demand and wages for blue collar workers, lack of economic opportunity for young high school and college graduates, the stagnant economy, international competition, our dependence on Middle Eastern oil: all these can be solved and the solution won't hurt.)

আমেরিকা যে এই ধরনেরর কাজ করার জন্য অনন্য সাধারণ তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছেন —

> উত্তর সত্যিই খুব সহজ. এটি এমন কিছু যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগে করেছে, এবং এটি সবসময় অতীতে কাজ করেছে। থমাস জেফারসনের প্রশাসনে ফিরে যাওয়ার নজির আমাদের রয়েছে এবং একটি সমাজ হিসাবে আমরা এই ধরণের করণীয় কর্তব্য গ্রহণ করার জন্য অনন্যসুলভ ভালো। (The answer is really very simple. It is something the United States has done before, and it has always worked in the past. We have precedents going back to the administration of Thomas Jefferson, and as a society we are uniquely well to take on a task of this kind.)

তার সেই সহজ সমাধানটি কী? তিনি সুপারিশ করেছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দরিদ্র রাশিয়ার কাছ থেকে সাইবেরিয়া নিয়ে নিক (প্রয়োজনে ক্ষতিপুরণ দিয়ে) এবং 'সাইবেরিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার বেসরকারিকরণ' করে তার থেকে মুনাফা করুক। বলেছেন —

> এই অঞ্চলে বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদের ভান্ডার সঞ্চিত আছে - তেল, গ্যাস, হিরা এবং সোনা। কাঠের অফুরন্ত উৎস হিসাবে বিশাল অরণ্যভূমি আছে; আছে বিশাল খনিজ সম্পদের ভান্ডার। এই সমস্ত সম্পদ রাশিয়ার অংশ হওয়ার চেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হওয়া বেশি যথার্থ। (This area contains some of the world's most valuable deposits of oil, gas, diamonds, and gold. There are vast stands of timber; huge mineral deposits. All of these resources are worth more as part of the United States than as part of Russia.)

বিশ্বে যেখানে যা কিছু আছে, যা মার্কিন ধনকুবেরদের কাছে লোভনীয় মুনাফার উৎস মনে হয়, তার উপর অধিকার দাবি করার সাম্রাজ্যবাদীদের এর চেয়ে খোলাখুলি ও নির্লজ্জ ঘোষণা আর কী হতে পারে?

তিনি প্রস্তাব করেছেন যে —

> তদুপরি, দক্ষিণ সাইবেরিয়ার উষ্ণ সমুদ্র বন্দর ভ্লাদিভোস্টক এশিয়ার অন্যতম সেরা পোতাশ্রয় এবং এটি জাপানি, চীনা এবং কোরিয়ান অর্থনীতির সঙ্গমে একটি অনন্য অবস্থানে আছে। এটি একবিংশ শতাব্দীতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সবচেয়ে গতিশীল শহরগুলির মধ্যে একটি হবে এবং মার্কিন সরকার বেসরকারি খাতে জমি বিক্রি করে

এবং দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির উপর শুল্ক আরোপ করে প্রচুর লাভবান হতে পারে। (Furthermore, Vladivostock, the warm water port in southern Siberia, is one of the finest harbors in Asia, and it enjoys a unique position at the crossroads, potentially, of the Japanese, Chinese, and Korean economies. This will be one of the most dynamic cities on the Pacific Rim in the 21st century, and the U.S. government will benefit enormously selling land to the private sector and levying taxes on a rapidly growing economy.)

দুইটি বিষয় খুব পরিষ্কার — এক হলো মার্কিন অর্থনীতির সংকট যে একটা অনিরসনীয় গিঁটের আকার নিয়েছে তার সরল বর্ণনা, এবং অন্যটি হলো তার থেকে পরিত্রাণ পেতে অন্যের সম্পদ দখলের সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যের নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি। এই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখেই যে, এই অঞ্চলের মার্কিন ভূরাজনৈতিক নীতি তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভূরাজনৈতিক শক্তি বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত মার্কিন নীতি নির্ধারক আলেকজান্ডার পিটার্সন তাঁর বই *The World Island: Eurasian Geopolitics and the fate of the West* -তে সুপারিশ করেছেন —

পশ্চিমা শক্তির 'ছোট ইউরেশিয়ান রাষ্ট্রগুলোকে' সাথে নিয়ে ইউরেশিয়ার বিষয়ে জড়িত হওয়া দরকার, বিশেষ করে 'নতুন পূর্ব ইউরোপীয়' রাষ্ট্রগুলো-ইউক্রেন, বেলারুশ এবং ককেশীয় রাষ্ট্রগুলো, সেইসাথে মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো। এভাবে পশ্চিমা শক্তি ইউরেশিয়ান বৃহৎ শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে রাশিয়ার অরক্ষিত তলপেট এবং চীনের পেছনের দরজার মাঝখানে-একটা শক্ত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে। (The West needs to be involved in Eurasia, in particular in the 'New Eastern European' states of Ukraine, Belarus, and the Caucasian states, as well as in the Central Asian states: together, the 'small Eurasian states.' In this way the West will be able to create a bulwark against the major Eurasian powers—between Russia's soft underbelly and China's back door. -p-114)

তার মতে —

> চীনারা এই অঞ্চলে ক্ষমতাকে প্রধানত, অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেখে যাতে অনুচ্চকিত রাজনৈতিক প্রভাবের বিস্তার করতে পারে। রাশিয়ানদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সংযোগ রক্ষা করা যার জন্য মজবুত রাজনৈতিক প্রভাব অর্জন করাই উদ্দেশ্য। রাশিয়া-চীন নেক্সাস কোন প্রকৃত জোটের সম্ভাবনার উদ্দেশ্যে নয়, বরং মধ্য ও অভ্যন্তরীণ এশিয়াকে বিভক্ত করার জন্য কোনো ধরনের চুক্তি সম্পাদন করা — সক্রিয়ভাবে হোক বা প্রভাবের বলয়ের জন্য হোক...এবং এইভাবে বিশ্বের এই অঞ্চলে বাণিজ্য ও কৌশলগত সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করা। (The Chinese see power in the region principally in terms of economic penetration leading to soft political influence. For the Russians it is security links leading to hard political influence. The Russia-China nexus is represented less by the prospect of a genuine alliance than by some sort of agreement to partition Central and Inner Asia — whether actively or in terms of spheres of influence — and thus to effectively control the trade and strategic potential of the World Island. P-114)

আমেরিকা যে ইউক্রেন ও জর্জিয়াকে ন্যাটোতে যুক্ত করতে চায়, তার কারণ এই অঞ্চলের উপর আমেরিকার সামরিক প্রভাব বৃদ্ধি করা। রাশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর যার নজর সে কিছুতেই রাশিয়া এবং চীনকে এই অঞ্চলের প্রভাববিস্তার করতে দিতে চায় না। এই উদ্দেশ্যে রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য নানারকম বিধিনিষেধ জারি করার কথাও বলা হচ্ছে, তার মধ্যে রাশিয়া-ইউরোপীয় ইউনিয়ন পাইপ লাইন নর্ড স্ট্রেম ওয়ান এবং নর্ড স্ট্রেম টু-এর মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের চুক্তি বাতিল করা। ইউরোপের গ্যাসের চাহিদার ৩৫ ভাগ মেটায় রাশিয়া। আমেরিকা এই চুক্তি বাতিল করার জন্য জার্মানির উপর চাপ অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু জার্মানির সামনে ভালো কোন বিকল্প নেই।

ইউক্রেন এবং রাশিয়া দুই দেশই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভূক্ত। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ইউক্রেন ছিল রাশিয়ার পরেই বড় ভৌগলিক অঞ্চল। ইউক্রেনকে একসময় ইউরোপের শস্য ভান্ডার বলা হতো। ইউক্রেনেও প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে যার উপর রাশিয়ারও দৃষ্টি আছে। ইউক্রেনে গত ২০১৪ সালেও রাশিয়া সমর্থিত সরকার ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু বিক্ষোভের মুখে সেই সরকারের পতন ঘটে, তারপর থেকেই ইউক্রেনের সম্পদের উপর রাশিয়া তার নিয়ন্ত্রণ

হারিয়েছে যা সে পুনরুদ্ধার করতে চায়। ২০১৪ সালের পর রাশিয়া ইউক্রেনের ক্রিমিয়া দখল করে নেয়। এর পরে দুই দেশের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে।

বর্তমানে আমেরিকার এক মেরু বিশ্বের 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়িত তো হয়ইনি, উপরন্তু অনেক পরাশক্তি নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে এসে উপস্থিত হয়েছে। এদের যার যার সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা পূরণের লড়াই মহাযুদ্ধের কালো মেঘ ডেকে এনেছে। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক স্যার ক্রিস্টোফার মুনরো ক্লার্ক বলেছেন, বর্তমান সময়ে সাম্রাজ্যবাদীদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব যেন পৃথিবীকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে নিয়ে গিয়েছে। তিনি বলেছেন —

> আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাদের পৃথিবী বেশি বেশি করে ১৯১৪ সালের মতো হয়ে উঠছে, তার চেয়ে কম কিছু নয়। ...আমরা সবেমাত্র এই সত্যটি মেনে নিতে শুরু করেছি যে, আমরা আর এমন একটি বিশ্বে নেই যেখানে দুটি পারমাণবিক মহাশক্তিধর দেশের মুখোমুখি অবস্থানের মাঝে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং আমরা যে অবস্থানের দিকে ফিরে যাচ্ছি তা হলো একটি বহুকেন্দ্রিক বিশ্ব যেখানে দ্বন্দ্বের অনেক উৎস রয়েছে। তাই কোন একভাবে, আমাদের বিশ্ব ১৯১৪ সালের দিকে ফিরে যাচ্ছে, যদিও আমাদের এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঝে সময়ের দূরত্ব দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। (It seems to me that our world is getting more like 1914, not less like it. ...We are just starting to come to terms with the fact that we are no longer in a world that is disciplined by the standoff between two nuclear hyper-powers. And what we are drifting back to is a polycentric world with many sources of conflict. So in some ways, our world is drifting back towards 1914, even if the ocean of time between us and the First World War gets larger and larger. (p-197, Next Great War)

ইউরোপে রাশিয়ার দুই প্রতিবেশী ফ্রান্স ও জার্মানির সাথে রাশিয়ার কূটনৈতিক তৎপরতা থেকে জানা গিয়েছিল যে ইউক্রেন বলেছে ন্যাটো জোটে ঢুকবে না, রাশিয়াও তার কিছু সৈন্যকে সীমান্ত থেকে তাদের গ্যারিসনে ফেরত পাঠাচ্ছে। এমন সংবাদে যখন এই ভেবে সবাই আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন যে এই মুহূর্তে হয়ত একটা সমঝোতা হবে, তখনই রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ২১ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের দক্ষিণ-পূর্ব দোনবাস (Donbas) অঞ্চলে বিদ্রোহীদের গঠিত দোনেৎস্ক এবং লুহানস্ক গণ-প্রজাতন্ত্রকে (Donetsk People's Republic

এবং Luhansk People's Republic) স্বাধীন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। রাশিয়ান নিউজ এজেন্সির খবর অনুযায়ী পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে যে রাশিয়া এবং এই দুই গণপ্রজাতন্ত্র বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই অবস্থায় সেই অঞ্চলের বিদ্রোহীদের সমর্থনে রাশিয়ার সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্তে উত্তেজনা চরম সীমায় পৌঁছেছে।

বস্তুতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা এবং সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার অভিসন্ধিতে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। দুই শিবিরেরই উদ্দেশ্য হলো বাজার এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামালের উপর নিজেদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে অপরের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা। বর্তমান রাশিয়া এবং পূর্বতন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের নীতি পর্যালোচনা করলেই সমাজতন্ত্রের সাথে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের পার্থক্য পরিস্কার হয়ে ওঠে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতে সমস্ত প্রজাতন্ত্রগুলো যোগ দিয়েছিল স্বেচ্ছায় এবং সংবিধান এই অধিকার নিশ্চিত করেছিল যে কোন প্রজাতন্ত্র নিজেরা সিদ্ধান্ত করে যে কোন সময় সোভিয়েত প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছেড়ে চলে যেতে পারে। ("Every Union Republic is reserved the right freely to secede from the U.S.S.R.-" Article17-, Constitution (Fundamental law) of the Union of Soviet Socialist Republics)। সমাজতন্ত্রই একমাত্র ব্যবস্থা যা কিনা মানুষের সার্বভৌমত্বকে শ্রদ্ধা করে এবং তাকে অক্ষুন্ন রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রতিটি জাতিসত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কমিউনিস্টরা মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের সংবিধানে এই অধিকার থাকার জন্যই ১৯৯১ সালে সহজে প্রজাতন্ত্রগুলো সোভিয়েত ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা দিতে পেরেছিল। কিন্তু এখন রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদের ইচ্ছে হলো পূর্বতন সোভিয়েত থেকে চলে যাওয়া সমস্ত প্রজাতন্ত্রকে গায়ের জোরে নিজেদের দখলে আনা, এই রাষ্ট্রগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং তার মাধ্যমে রাশিয়ার ক্ষমতার বলয় সম্প্রসারণ করা। রাশিয়ার এই কর্মকান্ডকে ইতিমধ্যেই চীন এবং ইরান সমর্থন জানিয়েছে। ফলে, যদি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ লেগে যায়, তবে তা আর স্থানীয় যুদ্ধ থাকবে না তা বলাই চলে।

বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্যকে সঠিক প্রমাণ করে। তিনি বলেছিলেন - 'সাম্রাজ্যবাদ হল লগ্নী পুঁজি এবং একচেটিয়া পুঁজির যুগ, যা স্বাধীনতার জন্য নয় , বরং সর্বত্র আধিপত্য বিস্তারের জন্য উগ্র প্রচেষ্টা চালায়। এই প্রবণতার ফলাফল হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে সর্বত্র

প্রতিক্রিয়ার এবং শত্রুতার চরম তীব্রতার জন্ম দেওয়া।' (Imperialism is the epoch of finance capital and of monopolies, which introduce everywhere the striving for domination, not for freedom. Whatever the political system, the result of these tendencies is everywhere reaction and an extreme intensification of antagonisms in this field. – Lenin, CW22-, p297-) লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে একদিকে রাশিয়া দোনেৎস্ক এবং লুহানস্ক অঞ্চলের মানুষের অভিপ্রায়ের কথা বলছে, অন্যদিকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গণতন্ত্র হত্যাকারী আমেরিকা ইউক্রেনের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের কথা বলছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ও বিবদমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এমন ভাষাতেই স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি কথা আউড়াচ্ছিল, যেন জনগণের স্বাধীনতার জন্যই তারা যুদ্ধ করছে, তখন লেনিন তাকে বলেছিলেন 'capitalist fraud'। বলেছিলেন 'এটা প্রতিদিনই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, এটা পুঁজিপতিদের মধ্যে, বড় বড় ডাকাতদের মধ্যে, কারা সবচেয়ে বেশি বড় ভাগ পাবে, কারা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দেশকে লুণ্ঠন করবে এবং কারা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক জাতিকে দমন করতে পারবে ও দাসত্ব করাতে বাধ্য করবে তা নিয়ে ঝগড়া করছে।' (It is becoming more evident every day that this is a war between capitalists, between big robbers, who are quarrelling over who is to get the largest slice, who is to plunder the greatest number of countries, and to suppress and enslave the greatest number of nations. Lenin, CW22-, p123-)

তাই, যে কারণে যুদ্ধের মহড়া সেই কারণগুলো মিলিয়ে যাবে না। আমেরিকা যে অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি পেতে এই পথে যেতে চায় সেই অর্থনৈতিক সংকট থাকবে – কারণ পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রেখে এই সমস্ত সংকটের থেকে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভবনা,

এই অঞ্চলের উপর রাশিয়া এবং চীনের ক্ষমতার বলয় বিস্তারের অভিপ্রায় থাকবে, সাইবেরিয়াসহ এই অঞ্চলের সম্পদ লুণ্ঠনের সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষও থাকবে। সেই কারণে সাময়িকভাবে যুদ্ধ পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়া গেলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার নয়। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে মহাযুদ্ধের আশঙ্কার মধ্যেই থাকতে হবে।*

* এই পুস্তিকা যখন ছাপা হয় তখন ইতোমধ্যে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা চলিয়েছে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিশ্বের পরিবেশগত বিপর্যয়ের মূল কারণ পুঁজিবাদ

পুঁজিবাদের উন্মেষের পর থেকে এই কয়েকশ' বছরের সময়কালের মধ্যেই পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে প্রকৃতি ও মনুষ্যসভ্যতা ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বিপর্যয়ের কারণ হলো অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা শিল্প-কারখানা থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড নির্গমণের কারণে জলবায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি, যথেচ্ছ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, বিপুল পরিমাণ ক্ষতিকর বর্জ্য সৃষ্টি, অরণ্য ধ্বংস, নদ-নদী, পুকুর, খাল-বিল বুজিয়ে ফেলে জীব-বৈচিত্র্যকে ধ্বংস ইত্যাদি ক্রিয়া-কাণ্ড যা পরিবেশের ক্ষতির কারণ হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদের মুনাফার লোভ প্রকৃতির স্বাভাবিক জলবায়ুর ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলছে। পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যেভাবে উষ্ণায়ন ঘটছে, যেভাবে প্রকৃতি ধ্বংস হচ্ছে তাতে বিশ্বের সকল দেশের মানুষই শঙ্কিত। স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্বের সর্বত্রই এই প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা হচ্ছে, বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ এর প্রতিবিধানের জন্য আন্দোলনও গড়ে তুলছেন। মানুষকে এটা বোঝানো এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থাকলে জলবায়ুকে রক্ষা করা যাবে না।

মার্কসবাদই একদম প্রথম থেকে মানুষকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে, মানুষও প্রকৃতির অংশ এবং সেই কারণে যদি প্রকৃতি না বাঁচে তবে মানুষও বাঁচবে না।

> বাস্তবে, মানুষ তার পুষ্টি, তাপ ব্যবস্থা, পরিচ্ছদ, বাসস্থান ইত্যাদির জন্য কেবল প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল ...মানুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে, যার অর্থ, প্রকৃতিই হচ্ছে তার শরীর এবং মৃত্যু থেকে বাঁচতে গেলে তাকে সবসময় প্রকৃতির সঙ্গে একটা সংলাপ চালিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি বলি মানুষের বস্তুগত ও মানসিক জীবন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাহলে তার অর্থ হচ্ছে প্রকৃতি নিজের সঙ্গেই যুক্ত। কারণ মানুষ প্রকৃতির এক অংশ। (Physically man lives only on these products of nature, whether they appear in the form of food, heating, clothes, a dwelling, etc. ...Man lives on nature — means that nature is his body, with which he must remain in continuous interchange if he is not to die. That man's physical and spiritual life is linked to nature means simply that nature is linked to itself, for man is a part of nature.) (রচনাবলি, খণ্ড-৩, পৃ-২৭৫-৭৬)

পুঁজিবাদের অপরিকল্পিত নগরায়ণ কীভাবে প্রকৃতির অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে সেই যুক্তি মার্কস উপস্থিত করেছেন। মার্কস *দাস ক্যাপিটাল*-এর তৃতীয় খণ্ডে 'The Genesis of Capitalist Ground Rent' আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন —

> বৃহৎ জমির সম্পদ কৃষিক্ষেত্রের জনসংখ্যাকে ক্রমাগত হ্রাস করে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং ফলশ্রুতিতে নিরন্তরভাবে বেড়ে চলা শিল্পক্ষেত্রে জনসমষ্টি বড় বড় শহরগুলিতে একসাথে ভিড় করতে থাকে। এর ফলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যা জীবনের প্রকৃতি-নির্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত সামাজিক আদান-প্রদানের সংহতিতে অপূরণীয় ভাঙনের সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ, মাটির প্রাণশক্তির তছনছ হয়ে অপচয় ঘটে এবং বাণিজ্য এই অপচয়কে কোন একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে বয়ে নিয়ে যায়। (On the other hand, large landed property reduces the agricultural population to a constantly falling minimum, and confronts it with a constantly growing industrial population crowded together in large cities. It thereby creates conditions which cause an irreparable break in the coherence of social interchange prescribed by the natural laws of life. As a result, the vitality of the soil is squandered, and this prodigality is carried by commerce far beyond the borders of a particular state (Liebig). পুঁজি, খণ্ড-৩, রচনাবলি-৩৭, পৃ-৭৯৯)

Anti-Duhring-এ এঙ্গেলস লিখেছেন আরও স্পষ্ট করে—

> সংক্ষেপে, জীব-জন্তু কেবল বাহ্যিক প্রকৃতি ব্যবহার করে এবং কেবল তার উপস্থিতির দ্বারা তাতে পরিবর্তন আনতে পারে; মানুষ এমনভাবে পরিবর্তন করে যাতে প্রকৃতি তার কাজে লাগে, প্রকৃতিকে শাসন করতে পারে। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে এটিই চূড়ান্ত, অপরিহার্য পার্থক্য এবং আবার সেই শ্রম যা এই পার্থক্য নিয়ে আসে।
>
> কিন্তু আমরা যেন প্রকৃতির উপরে মানুষের বিজয়ের জন্য নিজেদের অতিরিক্তভাবে স্তুতি না করি। এই রকম প্রতিটি বিজয়ের জন্য প্রকৃতি আমাদের উপর প্রতিশোধ নেয়। প্রতিটির ক্ষেত্রে প্রথম স্তরে এমন পরিণাম ডেকে আনে যার উপর আমরা ভরসা করি, তবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরে বিষয়টি বেশ আলাদা, এমন অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া হয় যা

কেবল প্রায়শই প্রথমটিকে বাতিল করে দেয়।

(In short, the animal merely uses external nature and brings about changes in it simply by its presence; man by his changes makes nature serve his ends, masters it. This is the final, essential distinction between man and the other animals and again it is labour that brings about this distinction.

But let us not flatter ourselves overmuch for our human victories over nature. For every such victory it takes its revenge on us. Indeed, each in the first place brings about the consequences on which we counted, but in the second and third place it has quite different, unforeseen effects which only too often cancel out the first ones.)

এছাড়া আর একটা কথা যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো, পুঁজিবাদের টিকে থাকার একমাত্র শর্ত হলো উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে সঞ্চিত পুঁজিকে ক্রমাগত স্থির পুঁজিতে (constant capital) বিনিয়োগ করে উৎপাদিকা শক্তিকে বৃদ্ধি করে যাওয়া এবং নিত্য-নতুন পণ্য ও তার চাহিদার সৃষ্টি করা। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ Schumpeter ব্যাখ্যা করে বলেছেন-

তাহলে, পুঁজিবাদ প্রকৃতিগতভাবে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের একটি রূপ বা পদ্ধতি এবং শুধুমাত্র কখনো নিশ্চল থাকে না তা নয়, কখনও নিশ্চল থাকতে পারে না। ...নতুন নতুন ভোগ্যপণ্য, নতুন নতুন উৎপাদন পদ্ধতি বা পরিবহন ব্যবস্থা, নতুন নতুন বাজার, শিল্প সংগঠনের নতুন রূপ যা পুঁজিবাদী উদ্যোগ তৈরি করে সেটাই মৌলিক তাড়না যা পুঁজিবাদী চালকযন্ত্রকে গতি দেয় এবং তাকে গতিশীল রাখে।

(Capitalism, then, is by nature a form or method of economic change and not only never is but never can be stationary. ...The fundamental impulse that sets and keeps the capitalist engine in motion comes from the new consumers' goods, the new methods of production or transportation, the new markets, the new form of industrial organization that capitalist enterprise creates.) (স্যুমপিটার, ১৯৭৫, পৃ-৮২-৮৩)

পুঁজিবাদের এই প্রক্রিয়াকে তিনি বলেছেন — The Process of Creative Destruction, সৃজনশীলভাবে ক্রমাগত ধ্বংস করে যাওয়ার পক্রিয়া। আর এই ধ্বংসসাধন সমাজের কল্যাণের জন্য নয়, মানুষের মঙ্গলের জন্য নয়, পুঁজির মুনাফার জন্য। মার্কসের অর্থনীতিতে বা সমাজতন্ত্রের অর্থনীতিতে টিকে থাকার জন্য কিন্তু এমন কোন শর্ত নেই। সমাজের প্রয়োজন না থাকলেও শুধুমাত্র মুনাফার জন্য বা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য নতুন নতুন পণ্যের প্রয়োজন হয় না। এর সাথে মনে রাখতে হবে যে, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নৈরাজ্য দূর করার জন্যই কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মার্কস পরিকল্পনার কথা বলেছেন। এই পরিকল্পনাই পারে একদিকে সামাজিক সম্পদের অপচয় বন্ধ করতে, অন্যদিকে সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে। 'পরিকল্পনা' — যা সমাজতন্ত্রের অন্যতম বিশেষ স্তম্ভ এবং মার্কসের প্রকৃতি ও জমি ধ্বংস সম্পর্কে ভাবনার কথা বিবেচনা করলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রকৃতি সংরক্ষণের কোন অসুবিধা তো নেইই, বরং সেটা অবশ্যম্ভাবী শর্ত। বরং বলা ভালো যে আমরা খুব বুঝতে পারছি পুঁজিবাদকে হটাতে না পারলে প্রকৃতি ধ্বংস বন্ধ করা যাবে না, অন্য কথায় সমাজতন্ত্র না এলে প্রকৃতিকে রক্ষা করা যাবে না।

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতিসংঘের আন্তঃসরকারি প্যানেলের (Intergovernmental Panel on Climate Change) পঞ্চম প্রতিবেদনেই এটা স্বীকার করা হয়েছিল যে, পৃথিবী আজ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির করুণ ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির মুখোমুখি হচ্ছে। সম্প্রতি, গত ৬ অগাস্ট ২০২১ জেনেভাতে ষষ্ঠ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে আবার উল্লেখ করা হয়েছে যে 'জলবায়ু পরিবর্তন ব্যাপক, দ্রুত এবং তীব্রতর হচ্ছে' (Climate change widespread, rapid, and intensifying)। এটা দ্ব্যর্থহীন যে মানুষের প্রভাব বায়ুমণ্ডল, মহাসাগর এবং ভূমিকে উষ্ণ করেছে। বায়ুমণ্ডল, মহাসাগর, ক্রায়োস্ফিয়ার এবং জীবজগতে ব্যাপক এবং দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। সামগ্রিক জলবায়ু ব্যবস্থা জুড়ে যে পরিবর্তন এবং জলবায়ু ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকগুলির বর্তমান অবস্থার সাম্প্রতিক পরিবর্তনের মাত্রা যে হারে পরিবর্তিত হয়েছে তা বহু শতাব্দী বা হাজার হাজার বছরের প্রেক্ষিতে অভূতপূর্ব। মানুষের চাপিয়ে দেওয়া জলবায়ু পরিবর্তন ইতিমধ্যেই বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে অনেক আবহাওয়া এবং জলবায়ুকে প্রভাবিত করছে। যে সমস্ত পরিবর্তন চরম মাত্রায় পরিলক্ষিত হচ্ছে, যেমন, তাপপ্রবাহ, ভারী বৃষ্টিপাত, খরা এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি তার প্রমাণ এবং বিশেষ করে, এইগুলো যে মানুষের কারণেই ঘটছে তা পঞ্চম মূল্যায়ন প্রতিবেদন (AR5) থেকে আরও বেশি জোরালোভাবে

ষষ্ঠ (AR6) প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

পুঁজিবাদের অর্থই হলো উৎপাদন ব্যবস্থায় অনিয়ন্ত্রিত নৈরাজ্য যা চালিত হয় একমাত্র মুনাফা দিয়ে, বাজার দিয়ে। তার সংকীর্ণ অর্থনৈতিক প্রয়োজনের জন্য প্রকৃতিকে রক্ষার তার ন্যূনতম আগ্রহও নেই। পূর্বে প্রকৃতি ধ্বংস নির্দিষ্ট এলাকা বা বিশেষ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু তা এখন গুণগতভাবে পরিবর্তিত হয়ে এমনভাবে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠেছে যে, একে প্রতিরোধ করতে না পারলে মনুষ্যসমাজ অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠবে। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে সতর্ক করেছেন যে, ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক তাপমাত্রা রোধ করতে ব্যর্থ হলে সমগ্র বিশ্ব মহামারি, রোগ, সমুদ্রের পানিরস্তর বৃদ্ধির জন্য উপকূল ডুবে যাওয়া, খরা এবং হ্যারিকেনের শিকার হবে। তাই, ২০১৫ সালে প্যারিসে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি থেকে কমানোর প্রচেষ্টার জন্য একটি চুক্তি হয়েছে। তদানুসারে ২০৩০ সালের আগে ৪৫% এবং ২০৫০ সালের আগে ১০০% গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে এবং তার জন্য শিল্প, পরিবহন, শক্তি এবং জমির ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন, যা আমেরিকাসহ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো করতে রাজি নয়। এই কারণে বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনও পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের অংশ।

মহামারি প্রমাণ করল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অমানবিকতা

কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে সময়ে নানা ঢেউ আবারও মহামারি মোকাবিলার সমস্ত ত্রুটিগুলিকে সামনে নিয়ে এসে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অদক্ষতা, অকার্যকারিতা, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার অভাব, মুনাফার লোভ ইত্যাদি প্রকাশ করে পুঁজিবাদের হিংস্র, অমানবিক এবং গণবিরোধী রূপ নতুন করে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আমাদের দেশে এবং বিশ্বের অন্য যে কোন দেশে।

বিশ্বায়নের মহাপুরুষদের ও প্রবক্তাদের অমৃত বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করে বিভিন্ন দেশের অনেক জনগণই সরকারি পরিষেবারও cost-effectiveness খোঁজে এবং সরকারের মুনাফার যৌক্তিকতার পক্ষে কথা বলে। বুর্জোয়া প্রচার যন্ত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য এতটাই যে, দুর্ভাগ্যজনক হলেও, কোন দেশের বামপন্থিরাই এই সব যুক্তিকে প্রতিরোধের সংস্কৃতি শক্তিশালীভাবে গড়ে তুলতে পারেনি। সেই দুর্বলতার সুযোগে দেশে দেশে পুঁজিবাদী সরকারগুলো মহামারি ঠেকানোর নামে মাঝে মাঝেই ডিগবাজি খাওয়া ছাড়া আর কিছুই করছে না। দরিদ্র খেটে-খাওয়া মানুষের বিকল্প রুজির বা জীবন ধারণের ব্যবস্থা না করেই কখনো লক-

ডাউন করছে, কখনো তুলে নিচ্ছে। মহামারিকে আটকানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সার্বিকভাবে ব্যর্থ তো হয়েছেই, কিন্তু কখনো যেটুকু অস্থায়ী ব্যবস্থা — তথা সেফ-হাউজ, হাসপাতালের বিশেষ ওয়ার্ড ইত্যাদি করেছে, গ্রাফ কিছুটা নামা মাত্রই তা আবার ভেঙে ফেলেছে। আবার গ্রাফ উর্ধ্বমুখী হওয়া মাত্র সরকারের অসহায় অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। পোস্ট-কোভিড উপসর্গের সঠিক চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা তো কল্পনারই বাইরে।

সর্বোপরি, শুরু থেকেই যা স্পষ্ট হয়েছে তা হলো এই সংকটে সামগ্রিকভাবে মানবতার ভাগ্য একসাথে বাঁধা। যতক্ষণ না সমগ্র পৃথিবী সুরক্ষিত হয়, কেউ নিরাপদ নয়। কিন্তু সচেতন মানুষ নিশ্চয়ই খেয়াল করবেন যে, বিশ্বায়নের পর থেকে পেটেন্ট-রাইট অত্যন্ত কড়া আইনের অধীন। সে কারণে বড় ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানিগুলোর পেটেন্ট বিশ্ববাসীর সঙ্গে শেয়ার না করার সিদ্ধান্ত অপরাধমূলক হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা কেউ নিতে পারছে না। পুঁজিবাদ শুধু মুনাফা বুঝে, পুঁজিবাদ এক হৃদয়হীন নির্লজ্জ ব্যবস্থা — সে মানুষ চেনে না, চেনে খদ্দের যদি তার কেনবার ক্ষমতা থাকে। বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে যা ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে তা নব্য-উদারবাদী উকিলদের সম্বিত ফেরানোর জন্য কি যথেষ্ট নয়? এক একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি এক একটা প্রতিষেধক বাজারে আনছে, আর তাদের শেয়ারের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। যেমন, Pfizer-এর আবিষ্কারের ঘোষণা মাত্র কোম্পানির শেয়ারের দর বাড়িয়ে দিয়েছে ৬.১%, অর্থাৎ অতিরিক্ত ১৭.৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য দুর্ভোগ, রোগ, মৃত্যু আর বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত কয়েকজনের জন্য শেয়ার বাজারের উচ্ছ্বাস। এটাই পুঁজিবাদ।

২০২১ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে, পেটেন্ট তুলে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) বৈঠকের কথা ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বিশেষ করে ইউরোপেরই অন্য কোন কোন দেশ প্রবল আপত্তি করায় সভাটি বাতিল করা হয়। এই হলো পুঁজিবাদ, যেখানে মুনাফার বিঘ্ন ঘটবে এই রকম যে কোন পরিকল্পনা তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য। আমরা মনে করি এটি একটি বাজার অর্থনীতি (অ্যাডাম স্মিথের বিখ্যাত অদৃশ্য হাত এবং সরবরাহ এবং চাহিদার নিয়ম)। যা আজ বিশ্বের স্বাস্থ্য, সামাজিক এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করতে পারে কিনা তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মানুষের অভিজ্ঞতা বলেছে — না, তা পারে না। উদারনৈতিকদের দাবি অনুযায়ী পুঁজিবাদকে 'সংশোধন' করে সংসদীয় পথে এই কাজ সম্পন্ন হবে না।

মহামারির এই বিপর্যয়কর ব্যবস্থাপনা মানুষের মধ্যে মেরুকরণকে বাড়িয়ে তুলছে। টিকা দেওয়া বনাম টিকাবিহীন, এক ডোজ নেওয়া বনাম দুই ডোজ নেওয়া, তরুণ বনাম বৃদ্ধ, স্বাস্থ্যকর্মী বনাম অন্যান্য পেশার কর্মী, শহরের শ্রমিক বনাম গ্রামের কৃষক, ধনী দেশের নাগরিক বনাম দরিদ্র দেশের নাগরিক। সমস্ত দেশের সরকারই সকল নাগরিককে সরকারি খরচে টিকাসহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার দায়িত্ব অস্বীকার করছে। রাষ্ট্র জনগণকে ভাগ করতে চায়, আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে জবাব দিতে হবে। প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট ভাবধারাসম্পন্ন দলগুলোর সঙ্গে এই বিষয়ে সংলাপ গড়ে তোলা, ঐক্য গড়ে তোলা।

বাংলাদেশ ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিপদ

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে মানবমুক্তির পথে চরম বাধা হলো সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে কমরেড স্ট্যালিন দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ তার আপেক্ষিক স্থায়িত্ব খুইয়েছে। 'বিশ্বায়নের যুগে সাম্রাজ্যবাদের গুণগত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে' বলে যত প্রচারই করা হোক না কেন, আজও আমরা লেনিন বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদের যুগে অবস্থান করছি। পরিমাণগত গুরুতর পরিবর্তন সত্ত্বেও তার কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ষাটের দশক থেকে গুরুতর সংশোধনবাদী বিচ্যুতি সত্ত্বেও যতদিন সমাজতান্ত্রিক শিবির ছিল ততদিন যুদ্ধের ভয়াবহতা এড়াতে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ বন্ধে একটা ভূমিকা পালন করতে সে বাধ্য ছিল। কিউবা থেকে শুরু করে আমাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধের মতো ঘটনায় তার উদাহরণ আছে। আজ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর দেশে দেশে যুদ্ধ বা সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপকতা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। সেই দিক থেকে বিশ্বপরিস্থিতি যুদ্ধবাজদের অনুকূলে ঢলে পড়েছে। যুগোস্লাভিয়া থেকে ইরাক পর্যন্ত সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বেপরোয়া সামরিক অভিযান, পূর্বদিকে ন্যাটো সামরিক জোটের সম্প্রসারণ, মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক আক্রমণ, ইরাকে পুতুল সরকারকে দিয়ে বিচারের প্রহসনে সাদ্দাম হোসেনের হত্যা, ইরানকে প্রতিনিয়ত হুমকি ও অর্থনৈতিক অবরোধ দিয়ে অস্থিতিশীল করে রাখা, শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে মার্কিন ও ইউরোপীয় সৈন্য প্রেরণ করে আফগানিস্তানকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা, অবয়বহীন সন্ত্রাসবাদের ধুয়ো তুলে বিশ্বের যেখানে খুশি সামরিক অভিযান চালানোর মার্কিন অধিকার সব দেশকে মানতে বাধ্য করা ইত্যাদি অসংখ্য দৃষ্টান্ত সাম্রাজ্যবাদের লাগামহীন জঙ্গি আগ্রাসী মনোভাবকেই প্রমাণ করে।

আবার, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে অর্থনৈতিক শক্তিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলোকে কাজে লাগাচ্ছে। আমাদের প্রতিবেশি মায়ানমারের অমানবিক গণহত্যার কারণে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আমাদের দেশে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসনের জন্য এই অঞ্চলের বৃহৎ শক্তিগুলি কোন কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। কারণ, চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের অন্যতম অংশীদার হলো মায়ানমার এবং এই অঞ্চলে বাণিজ্যপ্রসার ও বাণিজ্য পথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চীন মায়ানমার সম্পর্কে কোন বিরোধী অবস্থানে যেতে চায় না। একইভাবে ভারতও সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এবং ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অবদমিত জাতিসত্ত্বার আন্দোলনকে প্রতিহত করতে মায়ানমারের বিরোধিতা করে রোহিঙ্গাদের শর্তহীন পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার পক্ষে কথা বলা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয় মনে করে।

আমাদের প্রতিবেশি ভারত রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জনের কারণে এই উপমহাদেশের ছোট রাষ্ট্রগুলির মতো বাংলাদেশের কাছে বিপদ হিসাবে শুরু থেকেই ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় জনগণের উল্লেখযোগ্য ও কার্যকর সহায়তা একদিকে যেমন ছিল, তেমনি ভারতের শাসক শ্রেণির লক্ষ্য ছিল এই অঞ্চলে পাকিস্তানকে পরাস্ত করে তার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামরিক প্রভাবের বলয় প্রসার করা যাতে বাংলাদেশের বাজার ভারতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী একচেটিয়া পুঁজির দখলে রাখা যায়। শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির পর ভারত এখন কখনও প্রকাশ্য কখনও প্রচ্ছন্ন মার্কিন মদদে এই উপমহাদেশে নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। শ্রীলঙ্কা সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টির জন্য শ্রীলঙ্কায় তামিল জনগণের ন্যায্য গণতান্ত্রিক দাবির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে ভারতীয় শাসকশ্রেণি খোলখুলিভাবে মদদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদে রূপ দেয়। তারপর রাজীব গান্ধির সময়ে শ্রীলঙ্কা সরকারকে সমঝোতায় আসতে বাধ্য করার পর থেকে ভারতীয় শাসকশ্রেণি শ্রীলঙ্কার তামিল জনগণের ন্যায্য দাবিকে বাস্তবে পেছন থেকে ছুরি মারে। এককালে ভারতীয় শাসকরা নেপালে রাজতন্ত্র উৎখাত করে নেপালের কংগ্রেস দলকে ক্ষমতায় আনতে রানাশাহী-বিরোধী ন্যায্য আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। নেপালের শাসকরা বারবার অভিযোগ করেছে যে, নেপালকে চাপে রাখতে ভারতের শাসকরা একসময়ে তরাই অঞ্চলে (সমতল অঞ্চলে) নেপালের আন্দোলনকারীদের আশ্রয় পর্যন্ত দিয়েছিল। সেই ভারতীয় শাসকরাই পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক নেপালের দাবিতে গড়ে ওঠা জনগণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে

গিয়ে রাজতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। নেপালের পার্লামেন্টে পাশ করা সংবিধান ভারতের মনঃপূত না হওয়ায় তরাই অঞ্চল দিয়ে পণ্য চলাচলে অবরোধ সৃষ্টি করে নেপাল সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতেও ভারত পিছপা হয়নি। ভারত ও পাকিস্তানের বৈরিতামূলক সম্পর্ক এই অঞ্চলের জন্য সব সময় বিপজ্জনক ছিল এবং এখন তা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ভাঙনের আগে পর্যন্ত মার্কিন সরকারের অন্যতম বিশ্বস্ত সহযোগী ছিল পাকিস্তান। কারণ, সোভিয়েতের বিরোধিতা না করে, সোভিয়েতের প্রভাব খর্ব না করে আফগানিস্তানের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার ছিল অসম্ভব। কিন্তু সেই কাজে সোভিয়েতের সাথে সম্মুখ লড়াইয়ের ঝুঁকি ছিল। আল-কায়দার মতো সংগঠন গড়ে তুলে তাকে অর্থ ও অস্ত্র-সস্ত্র সরবরাহ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে সেই প্রক্সি লড়াই লড়েছে আমেরিকা। আবার, সেই আমেরিকাই আফগানিস্তানে সোভিয়েতের সহযোগী বারবাক কারমালের সরকারের পতনের পর যে আল-কায়দাকে তারাই একদিন গড়ে তুলেছিল তাকেই দমনের নামে আলকায়দা বিরোধী সামরিক হানাদারির শর্ত জুড়ে দিয়ে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে পাকিস্তানি জনগণের বিরুদ্ধে নামাতে বাধ্য করছে। এইসব কার্যসিদ্ধির পর আমেরিকার কাছে পাকিস্তানের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, কারণ আমেরিকা এই অঞ্চলে চীনের বিরুদ্ধে কৌশলগত কারণে পাকিস্তানের থেকে ভারতকে বেশি উপযোগী মনে করে।

এখন ভারতকে সহযোগী করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে নিরাপত্তার নামে গড়ে তুলেছে The Quadrilateral Security Dialogue (QUAD), যার অন্য দুই সহযোগী শক্তি হলো জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া। এই জোটকে কৌশলগত নিরাপত্তা সংলাপ বলা হলেও ইতিমধ্যেই সংগঠিত অভূতপূর্ব মাত্রার যৌথ সামরিক মহড়া প্রমাণ করে যে, আসল উদ্দেশ্য হলো এই অঞ্চলে চীনের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির পাল্টা কূটনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এরা উভয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার মহড়ায় এই অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্ম দিচ্ছে। এই লড়াইয়ের সাথে কোন দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের তো একেবারেই নেই। বলা বাহুল্য, এই দুই পরাশক্তির উপস্থিতিতে এশিয়া অঞ্চলে যুদ্ধের আশঙ্কা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যদি সেই যুদ্ধ লাগে তাহলে তার উত্তাপ ও ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে বাংলাদেশের মানুষ রক্ষা পাবে না।

এই অঞ্চলে যুদ্ধ লাগলে এবং কোন কারণে দুই আণবিক বোমার অধিকারী দেশ ভারত ও পাকিস্তান যদি এই বোমা ব্যবহার করে তবে সম্পদ নষ্টের কথা বাদই

দিলাম, যুদ্ধে কত কোটি মানুষের জীবনহানি ঘটবে তা ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়। মনে রাখা দরকার যে, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে তার থেকে মুনাফা করার বাসনা কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বের বুর্জোয়াদের আছে। ওয়াশিংটনের 'The Center for Strategic and International Studies (CSIS)', মার্কিন নীতি নির্ধারকদের গবেষণাভিত্তিক বুদ্ধি পরামর্শ দেওয়াই হলো যার কাজ, ২০১৩ সালে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে, যার শিরোনাম হলো — 'Red Lines, Deadlines, and Thinking the Unthinkable: India, Pakistan, Iran, North Korea, and China'। সেখানে বলা হয়েছে যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই অঞ্চলে আণবিক যুদ্ধ হলে বিপুল পরিমাণ প্রাণহানি ঘটবে, যাকে বলা হয়েছে 'human tragedy', তবে সেটা নাকি তাদের পক্ষে 'শুভ খবর', কারণ যুদ্ধের পর স্বল্পকালের জন্য হলেও তাদের উপকারে আসবে। তারা পণ্য এবং পরিষেবা বিক্রি করে মুনাফা করতে পারবে। (The good news, from a ruthlessly 'realist' viewpoint, is that such a human tragedy does not necessarily have serious grand strategic consequences for other states, and might well have benefits. Some fallout perhaps, but not that much in terms of serious radiation exposure in terms of exposure measured in rads. The loss of India and Pakistan might create some shortterm economic issues for importers of goods and services.-CSIR Report, 2013) এই হচ্ছে মুনাফালোলুপ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের আসল চেহারা। তারা ভিয়েতনামে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে অনুতাপে ভোগে না, ইরাকের সভ্যতাকে ধূলায় লুটিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে না, তারা লিবিয়াকে, আফগানিস্তানকে গণকবরে পরিণত করলেও বিন্দুমাত্র পরিতাপে ভোগে না। ঠিক, একইভাবে এই ভারত উপ-মহাদেশে কয়েককোটি মানুষকে হত্যাসহ কয়েকটি দেশকে মাটিয়ে মিশিয়ে দিতে তাদের বিবেকে বাধবে না। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের জন্য আজ বিশ্বের সর্বত্র সাধারণ মানুষ যে কত ভয়ংকর ঝুঁকির মধ্যে বাস করছে, পশ্চিমা বিশ্বের এই মনোভাবই তার প্রমাণ।

বাংলাদেশের দিকে ভারতীয় পুঁজির নজর নতুন কিছু নয়। কেবল তেল-গ্যাস বা পানি সম্পদ দখলই নয়, ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির অন্য কৌশলগত স্বার্থও এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছর পর বাংলাদেশের পুঁজিবাদ যত দুর্বলই হোক না কেন, বাংলাদেশ ভূ-রাজনৈতিক

কৌশলগত দিক থেকে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। তাছাড়া বঙ্গোপসাগরের কূলে অবস্থানের জন্য সামরিক দিক থেকে বাংলাদেশের বন্দরগুলি গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রাম বন্দরে অন্য কোনো শক্তির প্রভাব থাকাটা ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের পছন্দ না হওয়ারই কথা। ভারতের বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র পণ্য চলাচলের সহজ, সুলভ, সুরক্ষিত ও নিশ্চিত ব্যবস্থা। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে মহাসড়ক ব্যবহার করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাথে আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্য-পথ তৈরি করা, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের অন্যান্য বন্দরে পণ্য পৌঁছান এবং সেই পথে সর্বত্র ভারতীয় পণ্যের গমনাগমনের ব্যবস্থা করা ভারতের অনেকদিনের পরিকল্পনা। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বাজার বিস্তারের জন্যই ট্রানজিট-করিডোর তারা চাইছে এবং সেই অনুমতি ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সরকার দিয়েছে। যে মহাসড়ক নির্মিত হচ্ছে তার সাথে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির মুনাফার স্বার্থ জড়িত।

ভারত ও বাংলাদেশ, এই দুইদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির পানিসম্পদের ওপর একতরফা দখল কায়েম করাও ভারতের অন্যতম লক্ষ্য। তাই ভারতে ক্ষমতাসীন যে কোন সরকারই চায় বাংলাদেশের সরকারি ক্ষমতায় যে দলই আসুক তাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকাকে সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষমুক্ত নিছক বন্ধুসুলভ সাহায্যকারী হিসাবে তুলে ধরতে হবে সেই দলকে। গত এক দশকের অভিজ্ঞতা বলছে যে, ভারত তার স্বার্থ রক্ষাকারী শক্তিকে ক্ষমতায় আনতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করছে, নির্বাচনকে প্রভাবিত করছে এবং ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসা পক্ষকে স্বচ্ছ নির্বাচনের সার্টিফিকেট দিয়ে নিজের স্বার্থে তাকে ব্যবহার করছে। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য সাম্রাজ্যবাদী ভারত এক মূর্তিমান বিপদস্বরূপ তা জনগণ জানে, বুঝে কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার আস্ফালনে ভীত হয়ে তা বলতে পারে না। যদিও, দুই দেশের জনগণের ঐক্যে ফাটল ধরানোর উদ্দেশ্যে ও বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের জন্য মুখে ভারত-বিরোধী জিগির তোলা শক্তি যখন ক্ষমতায় থাকে তখন তাদেরও সাম্রাজ্যবাদী ভারতের দাবি মেনে নিতে আপত্তি থাকে না।

আবার, ভারতে বর্তমানে উগ্র হিন্দু মৌলবাদী দল সরকারি ক্ষমতায় আছে ২০১৪ সাল থেকে। আমরা দেখেছি মৌলবাদী বিজেপি যখন ক্ষমতায় ছিল না, তখন বাংলাদেশের মৌলবাদীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষ একথা ভুলতে পারে না, যখন বাংলাদেশের মানুষ গোলাম আযমসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে রাজপথে আন্দোলনে নেমেছে তখন কীভাবে বিজেপি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিশ্বাসঘাতক গোলাম আযমদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল।

ফলে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হলে, বিশ্বে মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের দাপট ও আমাদের উপমহাদেশে মার্কিন মদদে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ — এই দুই শক্তির বিরুদ্ধেই লড়তে হবে বাংলাদেশের মানুষকে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শুধু QUAD -এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেই হবে না। বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদীদের NATO তো ছিলই। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের পর পুঁজিবাদের পথে অগ্রসর হওয়া পূর্বতন প্রজাতন্ত্রগুলো নিজেদের মধ্যে সামরিক জোট করার উদ্যোগ নেয় এবং ১৯৯২ সালে স্বল্পমেয়াদি একটি জোট গঠন করে চলতে থাকে। বর্তমানে ২০০২ সাল থেকে ৬টি দেশ মিলে গঠন করেছে সামরিক জোট CSTO (Collective Security Treaty Organization)। মাঝে মাঝেই এই জোট সামরিক মহড়া দিচ্ছে, এমনকি সেন্ট্রাল এশিয়া অঞ্চলেও। CSTO সশস্ত্র বাহিনীর প্রবর্তন সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক জোটের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রই তুলে ধরে। তাই CSTO, NATO, QUAD ইত্যাদি কোন জোট কোথাও হস্তক্ষেপ করা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা চলে না। হস্তক্ষেপ করলে তারপর সশস্ত্র হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোন কার্যকারিতা নেই। ঠিক এই মুহূর্তে ইউক্রেনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদিকে বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোট — ন্যাটো এবং অন্যদিকে রাশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আমাদের সমস্ত সামরিক জোটের বিলুপ্তি চাওয়া প্রয়োজন, বিশ্ব জনমত গঠন করা প্রয়োজন, শ্রমিকশ্রেণিকে সচেতন করা প্রয়োজন এবং এই দাবিতে বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট দলগুলোর ভেতর সংলাপ চালানো প্রয়োজন, যেহেতু উল্লিখিত শক্তিগুলোই হবে সর্বহারা আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রধান সামরিক শক্তি।

সময়ের ডাক

তীব্র মন্দার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে ক্রমাগত যুদ্ধ, ধ্বংস, মানুষের মৃত্যু দেখিয়ে দিচ্ছে, মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় বিপদ হলো পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ। একে টিকিয়ে রেখে গণতন্ত্র রক্ষা, সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশ সম্ভব নয়। তাই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাতে হবে। বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও ক্রমাগত তাকে উন্নত থেকে উন্নততর করে মানবসভ্যতাকে পৌঁছে দিতে হবে সাম্যবাদী সমাজে — যেখানে ব্যক্তিসম্পত্তির পুরোপুরি অবসান ঘটবে। মার্কসবাদ দেখিয়েছে, এর একমাত্র পথ হলো শ্রেণিসংগ্রাম।

শ্রমিকশ্রেণি যাতে সেই পথ থেকে দূরে থাকে সেজন্য সমাজে বন্দোবস্তের অন্ত নেই। মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত সংশোধবাদী ও প্রতিবিপ্লবীদের হাতে

পড়ে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটার পর তাকে হাতিয়ার করে বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম জনগণকে বুঝাচ্ছে মার্কসবাদ, শ্রেণিসংগ্রাম-এগুলো সেকেলে তত্ত্ব। ইতিহাসের কষ্টিপাথরে এসব তত্ত্ব নাকি বাতিল হয়ে গিয়েছে, পরিসমাপ্তি ঘটেছে ইতিহাসের। আবার তথাকথিত প্রগতিশীলরা উত্তরাধুনিকতা, সাবলটার্ন ইতিহাসচর্চা ইত্যাদির নামে আসলে শ্রেণিসংগ্রামই যে সমাজের চালিকাশক্তি —মার্কসবাদের এই বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাটাকে ভুলিয়ে দিতে চাইছে। সাথে সাথে গণতন্ত্র ও ব্যক্তির অধিকারের নামে সমাজের সর্বক্ষেত্রে, যৌনজীবনসহ মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারকে পাকাপোক্ত করে মানুষের নৈতিক জীবনের অধঃপতন ঘটাতে চাইছে। এজন্য অশ্লীল সিনেমা, পত্রপত্রিকা, অশ্লীল বিজ্ঞাপন, পর্নোগ্রাফি, সাইবার পর্নো প্রভৃতি নানা দেশে পরিস্থিতি পরিবেশ ও গ্রহণযোগ্যতা অনুযায়ী ব্যাপক প্রচেষ্টা চালু রেখেছে। পাশাপাশি প্রগতির নামে এই নষ্টামিকে অজুহাত করে ধর্মীয় মৌলবাদীরা পশ্চাৎপদ কুসংস্কার, রক্ষণশীল নানা ধারণা প্রচার করে গণতান্ত্রিক চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করতে চাইছে। অন্যদিকে আমাদের অত্যন্ত সজাগ থাকা দরকার যে, মার্কসবাদের বুলি আওড়ে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসের রাস্তাকেই বাস্তবতা বলে যারা শ্রমিকশ্রেণিকে বিভ্রান্ত করছে, শ্রমিকশ্রেণিকে আন্দোলনবিমুখ করে তুলছে, সংসদীয় রাজনীতির ঘুরপাকে শ্রমিক আন্দোলনকে বন্দি করে ফেলতে চাইছে, পুঁজিবাদের আয়ুষ্কালকে দীর্ঘায়িত করতে চাইছে, তাদের ব্যাপারে। আমাদের এই দুই ফ্রন্টেই লড়াই চালাতে হবে।

দুনিয়ার দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম গড়ে তোলা ও বিশ্বাসাম্যবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে মার্কসবাদের মর্মবস্তু সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির ভিত্তিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার জন্য সারা দুনিয়ার কমিউনিস্ট-বামপন্থি-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও প্রগতিশীল জনতার কাছে তুলে ধরছি।

১) চল্লিশের দশক থেকে সর্বহারা আন্তর্জাতিক (communist international) অনুপস্থিত রয়েছে। গোটা বিশ্বের সমাজতন্ত্রের ভাবধারা অনুসারী শক্তির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা এখন সময়ের দাবি। তার নিরিখে এটা সাম্যবাদী আন্দোলনের একটা বড় দুর্বলতা। কারণ, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন একটা আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন। তাই বিশ্বের দেশে দেশে সংগ্রামরত সকল কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের মধ্যে উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়মিত সমালোচনা-আত্মসমালোচনা চালিয়ে মতপার্থক্যসমূহ দূর করার জন্য মতবাদিক সংগ্রামের মাধ্যমে এককেন্দ্রিক কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২) বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনসমূহের মধ্যে সংহতি স্থাপন ও আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা। কারণ পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের এ যুগে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কারখানা-সংস্থা ইত্যাদি বহু দেশে বিস্তৃত। এরা বহু দেশের মুনাফার উপর দাঁড়িয়ে একটি বিশেষ দেশের শ্রমিক আন্দোলন দমন করার সুযোগ পায়। পাশাপাশি কৃষক ও নারীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একই উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করার লক্ষ্যে বামশক্তি কেন্দ্রিক দেশে দেশে, অঞ্চলে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং ইতিমধ্যে গড়ে উঠা সংস্থা ও উদ্যোগসমূহকে সমন্বিত করে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এককেন্দ্রিক করার ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমস্ত শক্তিকে স্থান দিয়ে ব্যাপকতর ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে যে, এই বিষয়ে গোড়ামি, সংকীর্ণতা, একদেশদর্শিতা পরিহার না করতে পারার জন্যই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উদ্যোগ অকার্যকরি হয়ে পড়ে।

৪) দেশে দেশে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের অনুষঙ্গ মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী বিপ্লবী সংগ্রাম জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং একটি দেশের বিপ্লবী সংগ্রামকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের কবল থেকে রক্ষার জন্য দেশে দেশে সংহতি আন্দোলনকে শক্তিশালী করা।

৫) মানুষ হত্যা, দেশ দখল ও সম্পদ লুণ্ঠনের সমর প্রস্তুতি বন্ধ করা, সামরিক বাজেটে বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে বাতিল করা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা সকল দেশের সকল মানুষের জন্য বিনা মূল্যে আয়োজনের উদ্যোগ নেয়ার দাবিতে ছাত্র-যুব সমাজের আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংহতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

দুনিয়ার মজদুর এক হও!
জয় সমাজতন্ত্র। জয় সর্বহারা।
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, জিন্দাবাদ।
সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ, জিন্দাবাদ।